বাঘা যতীন

শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়,
১৮৮০ শকাব্দ

তিন টাকা

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা,
মুদ্রণী,
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের,
সকল সহকর্মী ও শিষ্যের
করকমলে

অনন্তরাম মজুমদার

রামবল্লভ মজুমদার

তস্য পুত্র — তারাচাঁদ মজুমদার → শশীভূষণ মজুমদার → রতিকান্ত মজুমদার

রতিকান্ত মজুমদার: আশুতোষ, কেশব, যতীন্দ্র, সুরেন্দ্রবালা, সুশীলা

সুরেন্দ্রবালা → **শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়**

তস্য জামাতা — গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায় → রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় → মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়: বসন্ত, হেমন্ত, দুর্গাপ্রসন্ন, অনাথ, ললিত, শরৎশশী, জয়কালী

শরৎশশী → **যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

ভূমিকা

এই বইএর ভূমিকা যাঁর লেখার কথা ছিল তিনি আজ লোকান্তরিত। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন এই রচনাটি চন্দননগর প্রবর্তক সংঘের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নবসঙ্ঘ'-তে প্রকাশিত হয়, তখন বাঙলার স্বনামধন্য বিপ্লবী-নেতা শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং-প্রবৃত্ত হয়ে আমাকে রচনাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করতে উৎসাহিত করেন এবং স্বয়ং এর ভূমিকা লিখে দেবেন বলেন। নানা কারণে আমার পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। ইতিমধ্যে গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে অমরদা ইহলোক ত্যাগ করেন। আজ সেই বই প্রকাশিত হলো— কিন্তু তিনি দেখে যেতে পারলেন না, আর আমারও তাঁর ভূমিকা দিয়ে বই প্রকাশ করার সৌভাগ্য হোল না। এ দুঃখ আমার মর্মান্তিক হয়ে রইল চিরদিনের জন্য।

আমার ত্রিশ বৎসরব্যাপী 'স্বদেশী জীবনে' আমি বাঙলাদেশের অসংখ্য বিপ্লবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে এসেছি এবং তাঁদের নিবিড় ভালবাসা লাভ করেছি। যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী এবং শিষ্যদের মুখে বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনের এবং যতীন্দ্রনাথের জীবনের বহু কাহিনী এবং তথ্য শুনেছি। ত্রিশ বৎসর ধরে আমি একটা স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ সেই সব কাহিনী, যেখানে যা পেয়েছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনেছি এবং তাই থেকে একটা পারম্পর্য-বিশিষ্ট সমগ্র কাহিনী রচনা করেছি। একটা বিষয় নিশ্চিতরূপে বুঝেছি যে, যতীন্দ্রনাথের জীবনের সব কথা কোন ব্যক্তিই জানতেন না। যাঁরা তাঁর সহকর্মী ছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর জীবনের কথা ও ঘটনা আংশিকভাবে জেনেছিলেন। যিনি যেটুকু দেখেছিলেন তিনি সেইটুকু জেনেছিলেন, সমগ্রটা কোনজনই দেখেনও নি, জানেনও নি।

যতীন্দ্রনাথকে আমি ছোটবেলায় দেখেছি, তাঁর কোলেপিঠে উঠেছি। তিনি সম্পর্কে আমার মাসতুত দাদা ছিলেন। উভয়েই আমরা মাতুলালয় কয়া-তে জন্মেছি এবং মানুষ হয়েছি। তাঁর মাতুলালয় এবং আমার মাতুলালয়

ছিল পাশাপাশি বাড়ি। তাঁর বাল্যের কথা ও কয়ার জীবনের কথা আমি আমার দিদিমা, দাদামহাশয় এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের কাছে জেনেছি; আর কিছু কিছু আমার নিজেরই প্রত্যক্ষ জানা। সে-সব কাহিনী আমি লিখেছি। তাঁর জীবনের সে-সব ঘটনা ও কাহিনীও তাঁর বিপ্লবী জীবনের ঘটনাবলী ও কাহিনী অপেক্ষা কিছুমাত্র কম মহিমময় নয়।

যে-সব বিপ্লবীর কাছে বাঙলার বিপ্লব আন্দোলন ও যতীন্দ্রনাথের জীবনের কাহিনী ও স্মৃতিকথা শুনেছি তাঁদের নাম: স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), স্বর্গত কিরণ মুখোপাধ্যায় (দৌলতপুর সত্যাশ্রম ও সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা), স্বর্গত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (কলিকাতা ও হালিসহর), স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র দাস (মাদারীপুর), স্বর্গত অনুকূল মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গত গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মলঙ্গা লেন, কলিকাতা), স্বর্গত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), স্বর্গত মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী (হুগলী), স্বর্গত বিজয়কৃষ্ণ রায়, কবিরাজ (যশোহর), স্বর্গত সত্যেন সেন, স্বর্গত অমরেশ কাঞ্জিলাল ও স্বর্গত মোহিনী মজুমদার (যশোহর), স্বর্গত সুরেশ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকা), শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর), শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী (২৪ পরগণা), শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল (কুষ্টিয়া), শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী (বরিশাল), শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (খুলনা), শ্রীবিভূতিভূষণ দেবরায় (যশোহর) প্রভৃতি।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি থেকে সাহায্য পেয়েছি: স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "নির্বাসিতের আত্মকথা", স্বর্গত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত "বন্দী জীবন", স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার সরকার প্রণীত "Revolutionaries of Bengal", শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রণীত "বারীন্দ্রের আত্মকথা", শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "কানাইলাল", Government of India প্রকাশিত "Sedition Enquiry Committee Report" প্রভৃতি।

উপরিল্লিখিত ব্যক্তিগণ, যাঁদের সাহায্যে এই রচনা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকার অবদান আজ প্রণত-চিত্তে স্মরণ করি। চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত রচনাটি ধারাবাহিকভাবে তাঁর সম্পাদিত 'নবসঙ্ঘ' পত্রিকায়

প্রকাশ করেছিলেন। পুস্তক রচনাকালে স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান হীরালাল মোদক, শ্রদ্ধাস্পদ মামাবাবু শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও নির্যাতিতা রাজনৈতিক কর্মী প্রীতিভাজনীয়া শ্রীপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি অশেষ উৎসাহ দিয়েছেন। এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বন্ধুবর সহকর্মী শ্রীপবিত্র কুমার রায়চৌধুরী সযত্নে সমস্ত প্রুফ্ দেখে দিয়েছেন—তাঁকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর জন্যই এই বই-এর প্রকাশনা সম্ভব হোল। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রার্থনা করি, উপন্যাস সাহিত্যের মতই জাতীয় সাহিত্যের প্রসারেও তাঁদের বলিষ্ঠ অবদান সার্থক হয়ে উঠুক।

বুড়োশিবতলা,
চন্দননগর
৭ই আষাঢ়, ১৩৬৫

শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাঘা যতীন প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার দেড় বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। পাঠকবর্গের ক্রমবর্ধমান উত্তরোত্তর চাহিদার জন্য এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় বাঘাযতীনের আদর্শ প্রচার করার বিশেষ প্রেরণা অনুভব করায় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হোল। বর্তমান সংস্করণে বইখানিতে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হোল এবং কিছু কিছু পরিমার্জন সাধিত হোল। অলমিতি—

বুড়োশিবতলা,
চন্দননগর

শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়

যৌবনে যতীন্দ্রনাথ

বাল্যকাল

পরম ধার্মিক, ভগবদ্ভক্ত ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ অনন্তরাম মজুমদার আজ ভাগ্যদোষে কারাগারে বন্দী। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বাতায়নশূন্য গবাক্ষবিরল একটি পাষাণ-কক্ষে তিনি আবদ্ধ রয়েছেন। ব্রাহ্মণ রানী ভবানীর জমিদারী পদ্মাতীরস্থ শিলাইদহ-ডিহির কর্মচারী। অন্যান্য ঈর্ষ্যাপরায়ণ কর্মচারীরা ষড়যন্ত্র করে নানাপ্রকারের মিথ্যা কান-ভাঙানি দিয়ে সদর দেওয়ানের মনে অনন্তরামের বিরুদ্ধে সন্দেহ উৎপাদন করেছেন। দেওয়ান অনন্তরামকে সদরে তলব করে নিয়ে গেছেন ডিহি-র যাবতীয় হিসাবের কাগজপত্র সহ। অনন্তরামকে হিসাবনিকাশ দিতে হবে। হিসাবনিকাশ যতদিন না হয়, দেওয়ান অনন্তরামকে গারদে বন্ধ রাখার আদেশ দিয়েছেন! এদিকে দেওয়ান হিসাবনিকাশ আরম্ভও করছেন না, ওদিকে অনন্তরামও দিনের পর দিন গারদে পড়ে পচ ছেন।

দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত্রি কাটে, দিন আসে—অনন্তরাম বন্দীশালায় আবদ্ধ। মাঝে-মাঝে চোখ দিয়ে তাঁর হু-হু করে জল পড়ে! কাঁদতে কাঁদতে তিনি ইষ্টদেবতাকে ডেকে বলেন: "গোপীনাথ, তোমার সেবায় কত অপরাধ করেছি, তোমাকে ভুলে বিষয়চর্চা করেছি, তাইত দয়াল তুমি দয়া করে এখানে এনেছ! এবার সব কর্মের শেষ হয়েছে, সব চিন্তার অবসান এসেছে। খালি তুমি আর আমি, মাঝখানে আর কাউকে রাখনি; কিন্তু প্রভু, দেখা ত তুমি দিলে না! মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী, চরণে নূপুর—যে মূর্তির বিগ্রহ তোমার সারাজীবন পূজা করেছি, সেই মূর্তিতে দেখা দাও। তোমার দেখা যদি পাই গোপীনাথ তা'হলে আমার সকল যন্ত্রণা, সকল কলঙ্ক

সার্থক হবে। যন্ত্রণার মোচন কলঙ্ক-ভঞ্জন আমি চাই না ঠাকুর। আমি চাই শুধু তোমার দর্শন।” ব্রাহ্মণ কাঁদেন আর গোপীনাথকে ডাকেন। কায়মনোবাক্যে তিনি সারাজীবন গোপীনাথের সেবা করেছেন, পূজা করেছেন। অতি পবিত্র ও সৎভাবে তিনি বিষয়-কর্ম করেছেন আর দিবানিশি মন-ভ্রমর তাঁর গুঞ্জন করেছে গোপী-নাথের শ্রীপাদপদ্মে। আজ চরম দুঃখের দিনে গোপীনাথের বিগ্রহ-মূর্তি কাছে নেই; তিনি তাই স্বয়ং গোপীনাথের সাক্ষাদ্দর্শন কামনায় ব্যাকুল হয়ে কাঁদেন: “দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও। মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী, চরণে নূপুর, গলায় বনমালা পরে সমুখে এসে দাঁড়াও।”

এদিকে শিলাইদহের পাষাণ-দেবতার বুকেও কি বিরহব্যথা ফুটে ওঠে? স্নানযাত্রার দিন যতই নিকটবর্তী হয়ে আসছে, পূজারীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে যেন গোপীনাথের মূর্তি দিন-দিন মলিন হয়ে আসছে। একদিন তিনি এসে বললেন: “নায়েব মশাই, গোপীনাথের অসুখ করেছে।” সকলে ত হেসেই খুন, ঠাকুরের কি আবার অসুখ করে? পূজারী বললেন: “নিশ্চয়ই অসুখ করেছে, নৈলে ঠাকুরের মুখ দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্ছে কেন, চোখ কেন তাঁর ছলছল করে?”

রাত্রি দ্বিপ্রহরে রানী ভবানী স্বপ্ন দেখে চমকে জেগে ওঠেন। সর্বাঙ্গ তাঁর ঘর্মে সিক্ত হয়ে গেছে। গোপীনাথ এসে তাঁকে বলছেন: ‘আমার ভক্ত অনন্তরামকে তুই কেন গারদে পুরে রেখেছিস, ভাল চাস তো তাকে ছেড়ে দে ভবানী!’ ভবানী কিন্তু বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না। প্রত্যূষ-বেলাতে তিনি দেওয়ানজীকে ডেকে এনে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বললেন তাঁকে। দেওয়ানজীও রানীকে জানালেন অনন্তরামকে গারদে আটক রাখার বৃত্তান্ত। তখনি অনন্তরামকে মুক্তি দেওয়া হ’ল। হিসাব দেখা আরম্ভ হল তৎক্ষণাৎ। অনন্তরাম পরিষ্কার হিসাব-নিকাশ দাখিল করলেন। তন্ন-তন্ন করে সমস্ত

হিসাবের কাগজপত্র মন্থন করে দেখা গেল—অনন্তরাম মনিবের একটি কাণাকড়িও তছরূপ কি অপব্যয় করেন নি। তাঁর মত সাধু এবং মিতব্যয়ী কর্মচারী জমিদারী সেরেস্তায় দেখা যায় না। রানী ছিলেন মহীয়সী নারী, পুণ্যবতী, দানশীলা ও গুণগ্রাহিনী। অনন্তরামের ভগবদ্ভক্তি, ধর্মভাব ও সাধুতাতে তিনি মোহিতা হলেন। নির্দোষী অনন্তরামের নির্যাতনের জন্য রানীর মনে অনুশোচনাও হ'ল যথেষ্ট। অনন্তরামকে তিনি বললেনঃ "বাবা, আপনাকে আমি কিছু দান করতে চাই, গ্রহণ করে আমাকে সুখী করুন। আপনি আমার সাধ্যায়ত্ত যা চাইবেন, আমি তাই আপনাকে দেব।" রানী আজ মুক্তহস্তা। গোপীনাথের ভক্তকে তাঁর অদেয় আজ কিছুই নাই। অর্থ বা জায়গীর যা পেলে অনন্তরাম সন্তুষ্ট হবেন, রানী আজ তাঁকে তাই দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। প্রসন্ন হাস্যে অনন্তরাম বললেনঃ "বেশ মা, আমি আপনার কাছে যা চাইব, তাই আপনি আমাকে দেবেন, সত্য করুন।"

রানী সত্য করলেন।

অনন্তরাম বললেন ঃ "যে গারদ-ঘরে আমি বন্দী ছিলাম, সেই ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে কেন জানি না একখানা বাঁকা খুব পাকা বাঁশ বাঁধা আছে। ঐ বাঁশখানা আমাকে দিন, ওটাতে আমার গোপীনাথের বড় চমৎকার ঝুলনা তৈরি হবে।"

অনন্তরামের প্রার্থনা শুনে রানী তো অবাক। তিনি বললেনঃ "বেশ, ঝুলনা করবার জন্য বাঁশ আমি এক্ষুণি লোক দিয়ে আপনার গৃহে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি কি নেবেন বলুন—অর্থ, সম্পত্তি, কি চাই আপনার বলুন।" অনন্তরাম বললেনঃ 'ভবকূপে পড়ে বিষয় আর অর্থ নিয়ে গোপীনাথকে ভুলে আছি মা, আর প্রলোভন বাড়াব না। সম্পত্তি কি অর্থ আমি কিছুই নেব না।'

রানী অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু অনন্তরাম কিছুতেই দান নিলেন না, অতি আনন্দিত চিত্তে বাঁকা বাঁশটি নিয়ে এলেন গোপীনাথের ঝুলনা করবার জন্য।

অনন্তরামের 'মজুমদার' উপাধি তাঁর পৈতৃক আমলের অর্জিত নবাব-দত্ত সম্মান। তিনি ছিলেন শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁর বাস ছিল নদীয়া জেলার (বর্তমানের পাকিস্তানের অন্তর্গত কুষ্টিয়া জেলার) অন্তর্গত কয়া গ্রামে। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর বৈষয়িক অবস্থা ছিল খুবই সম্পন্ন। অধিকাংশ অর্থই তিনি ব্যয় করতেন দান, সদাব্রত, দেবসেবা প্রভৃতি কার্যে। অনন্তরামের মত ভগবদ্ভক্ত ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ সে যুগেও খুব বিরল ছিল। এই অনন্তরামের দেহের শোণিত-ধারা প্রবাহিত ছিল মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের ধমনীতে।

অনন্তরামের পৌত্রীর বিবাহ হয় গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত। গৌরমোহন মজুমদারবংশে বিবাহ করে কয়া গ্রামে এসে বাস স্থাপন করেন। গৌরমোহনের মৃত্যু হ'লে, তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হন। তাঁকে সহমরণে নিবৃত্ত করার জন্য যখন সকলে তাঁকে পুড়ে মরা যে কত ক্লেশজনক, সে সম্বন্ধে বোঝাতে লাগলেন, তিনি তখন উনানে পায়স রান্না আরম্ভ করলেন এবং পায়স যখন ফুটতে লাগল, তখন ধাতু-নির্মিত হাতার পরিবর্তে সেই ফুটন্ত পায়স নিজের দক্ষিণ কর-পল্লবে ঘুঁটতে লাগলেন। সেই দৃশ্য দেখে সকলেই বিমনা হ'লেন। তিনি সকলকে আশীর্বাদ করে হাসিমুখে স্বামীর চিতায় আরোহণ করলেন। এই গৌরমোহন ও তদীয় সহমৃতা পত্নীর সন্তান রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়। রামসুন্দরের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

যতীন্দ্রনাথের চিত্তে একদিকে সঞ্চারিত হয়েছিল অনন্তরামের ভগবদ্ভক্তি, নিস্পৃহতা ও সাধুতা, অপরদিকে সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর বৃদ্ধ-প্রমাতামহীর (গৌরমোহনের স্ত্রী) আত্মোৎসর্গ করার দুর্জয় সাহস। ইহা ভিন্ন পিতা-মাতা, মাতুল, মাসীমাতা ও অপর গুরুজনদিগের নৈতিক শক্তি ও গুণ তাঁর চরিত্রে বিসর্পিত হয়েছিল। তারও কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া গেল।

যশোর জেলার ঝিনেদা মহকুমার হরিণাকুণ্ডু থানাতে রিশখালি গ্রামে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন বিঘে কয়েক ব্রহ্মোত্তর-ভোগী। অবস্থা তাঁর উঁচু ছিল না ; কিন্তু মাথা ছিল উঁচু। রিশখালি গ্রামের কাছেই নবগঙ্গা নদীর তীরে সিঁদরে নামে এক গ্রাম, সেইখানে ছিল নীলকর সাহেবদের এক কুঠি। কুঠিয়াল ছিলেন শেরিফ সাহেব, দুর্ধর্ষ নীল-কুঠিয়াল। তাঁকে ভয় করত ঝিনেদা মহাকুমার দারোগা, পুলিস, জমিদার, গাঁতিদার, চাষী—সকলেই। সাহেব যখন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে যেতেন, যে কেউ তাঁর সামনে পড়ত, সকলেই মাথা নিচু করে তাঁকে সেলাম করত। জমিদার, জোতদার, গাঁতিদারেরা পর্যন্ত পাল্কী থেকে নেমে সাহেবকে সেলাম করতেন। শুধু মাথা নিচু করতেন না সাহেবের কাছে এই মুখুয্যে মহাশয়। সে-যুগে এ রকম প্রবল-প্রতাপান্বিত দুর্ধর্ষ নীল-কুঠিয়াল সাহেবের কাছে যে মাথা নিচু হ'ত না, সে মাথা যে কতখানি উঁচু ছিল আর তার অধঃস্থ মেরুদণ্ডটি যে কতখানি শক্ত ছিল, আজকের দিনে তার যথার্থ ধারণা করা কঠিন। সে মাথা গুঁড়বে, তবু আনত হবে না ; সে মেরুদণ্ড ভাঙবে, তবু দোমড়াবে না। মুখুয্যে মশাই মাত্র একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রেখে অল্প বয়সে মারা যান। ইনিই যতীন্দ্রনাথের জন্মদাতা পিতা—স্বর্গত

উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মেয়ের নাম বিনোদিনী, ছেলের নাম যতীন।

মুখুয্যে-গৃহিণী অল্প বয়সে বিধবা হয়ে মেয়েটিকে ও ছেলেটিকে নিয়ে পিত্রালয় কয়াতে এলেন ভায়েদের আশ্রয়ে। গ্রামের পশ্চাতে তিন মাইল দূরে পদ্মা; সম্মুখে পদপ্রান্তে পদ্মার শাখানদী গড়াই। পদ্মারই যুবতী মেয়ে গড়াই, মায়ের মতই অতল-গভীর-বিশালকায়া। বর্ষাকালে গড়াই-এর মূর্তি হয় ভীষণা, ভয়ঙ্করী। দুর্বার স্রোতস্বিনী তটবিপ্লাবিনী গড়াই-এর বুকে তখন নেচে ওঠে কোটি-কোটি প্রলয়ঙ্কর তরঙ্গ ও আবর্ত। নিরবচ্ছিন্ন ভীম গর্জন গোঁ-গোঁ-সোঁ-সোঁ করে তার অনন্ত অগাধ গৈরিক জলরাশি ছুটে চলে যেন প্রলয়-নৃত্যে। তখন নদীতীরে ঘাটে-ঘাটে লোকে স্নান করে দলবদ্ধ হয়ে, কুমীরের ভয়ে কেউ একা জলে নামতে সাহস করে না। এমন কি একা তখন নদীর তীরে দাঁড়ালেও, নদীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে ভয়ে লোকের গা ছমছম করে। কিন্তু কয়া গ্রামের সেই অল্পবয়স্কা বিধবা রমণীটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তিনি বর্ষাকালেও নিত্য স্নানে আসেন পাঁচ বছরের হৃষ্টপুষ্ট চঞ্চল ছেলেটিকে কোলে করে নির্জন ঘাটে। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেন আর ছেলেটিকে সাঁতার শেখান। মাঝে-মাঝে ছেলেটিকে জলে দূরের দিকে ঠেলে দেন আর অভয় দিয়ে বলেন: "ভয় কি যতি, আরও এগিয়ে যা, আরও এগিয়ে যা!"

লোকে কেউ হঠাৎ এসে দেখলে আতঙ্কে শিউরে উঠে বলে: "উঠে পড় বাছা, উঠে পড়। প্রাণে কি তোমার ভয় নেই একটুও? আর ঐ-টুকু ছেলেও ত সাংঘাতিক, ওরও কি প্রাণে ভয় নেই?"

রমণী মৃদু হেসে বলেন : "ও আমার বেটা-ছেলে, তুচ্ছ গড়াই নদীকে ভয় করবে কেন ও ?"

তুচ্ছ গড়াই নদী !

যে শোনে, সে বিস্ময়ে নির্বাক্ হয়ে যায়।

ইনিই যতীন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী জননী ৺শরৎশশী দেবী।

কৃষ্ণনগর বারের সেরা উকিল, বিরাট পসার, দু'জন মুহুরী, অগাধ উপার্জন। দিবারাত্রি মস্তিষ্ক তাঁর জটিল মামলার নীরস নথিপত্র আর আর্জি-জবানবন্দীর গোলক-ধাঁধার মধ্যে ডুবে থাকে ; কিন্তু হৃদয়টি বড় কোমল, বড় দয়ার্দ্র। ছুটির সময়ে শহর ছেড়ে চলে আসেন পল্লীভবন কয়াতে। ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সকল স্বগ্রামবাসীর বাড়ি-বাড়ি তিনি ঘুরে-ঘুরে বেড়ান। কোন অনাথা বৃদ্ধা শীতে কষ্ট পাচ্ছে, তাকে তিনি লেপ-কম্বল কিনে দেন—কারও ঘরের চালে খড় নেই, তার চাল ছাইয়ে দেন—কেউ অসুখে ভুগছে, পয়সা নেই, তাকে ঔষধ-পথ্য কিনে দেন। প্রাণঢালা সহানুভূতি দিয়ে তিনি ব্যথিতের বেদনার প্রশমন করেন, অজস্র অর্থব্যয় করে দুঃখীর দুঃখ মোচন করেন।

ইনিই যতীন্দ্রনাথের বড় মামা ৺বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কলকাতা শহরে শোভাবাজারে চিৎপুর রোডের উপরে মস্ত এক দোতলা বাড়িতে বাস করেন মস্ত পসারওয়ালা এল্. এম্. এস. ডাক্তার। ডাক্তারবাবুর মাত্র দুটি ছেলে ; কিন্তু গৃহ তাঁর ভর্তি অনেক ছেলেতে। কেউ স্কুলে, কেউ কলেজে পড়ে। কয়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির যত ছেলে কলকাতায় পড়ে, সকলে বাস করে এখানেই। খাওয়া-পরা, স্কুল-কলেজের বেতন সবই দেন ডাক্তারবাবু। এই

সকল আশ্রিত ছেলেরা যা খায়, যা পরে, তাঁর নিজের ছেলে দুটিও তাই খায়, তাই পরে। ডাক্তারবাবু প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন; কিন্তু সমস্তই খরচ করেন দেশের ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্য। তাছাড়া তাঁর বাড়িটা যেন একটা ধর্মশালা। কয়া অঞ্চলের যে সকল লোক কার্যোপলক্ষে কলকাতায় আসেন, তাঁরা নিজেদের দরকারমত বা ইচ্ছামত এই বাড়িতেই বাস করেন, আহারাদি করেন, আবার প্রয়োজনানুসারে ডাক্তারবাবুর কাছে টাকা ধারও নেন। ডাক্তারবাবু সকলকেই ধার দেন; কিন্তু কেউ তাঁকে শোধ দেন না। ডাক্তারবাবুর মনে আপন-পর ভেদজ্ঞান ছিল না। দীর্ঘকাল ডাক্তারী ব্যবসাতে তিনি নিজের বা পুত্রদের জন্য কোন সঞ্চয়ই রাখেন নি, সমস্ত অর্থই তিনি খরচ করে গেছেন দেশের ছেলেদের শিক্ষার জন্য আর দেশের লোকেদের আতিথ্যের জন্য।

ইনিই যতীন্দ্রনাথের মধ্যম মাতুল ৺হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাত্রে রান্নাবান্না শেষ করে, ঘরকন্নার কাজ শেষ করে, নিজের খাবার ঢেকে রেখে, স্নান করে, কাপড় ছেড়ে শান্ত-শুদ্ধ মনে রমণী বসলেন পূজা করতে। পূজা শেষ করে তিনি আহার করবেন। পূজান্তে বিগ্রহের সম্মুখে তিনি গললগ্নীকৃত-বাসে ধ্যান আরম্ভ করলেন। সমস্ত চিত্ত ধ্যানে মগ্ন তদ্গত হয়ে গেল। যখন ধ্যানভঙ্গ হ'ল, তিনি চেয়ে দেখেন—আকাশ ফরসা হয়ে গেছে, গাছের ডালে-ডালে পাখীরা কলরব আরম্ভ করেছে।

বিগ্রহকে প্রণাম করে তিনি স্নান করতে বেরিয়ে পড়লেন। রাত্রি প্রভাত হয়ে গেছে। কদাচিৎ এক রাত্রি নয়, এরকম হয়, তাঁর প্রায়ই।

ইনি যতীন্দ্রনাথের মাসীমাতা ৺জয়কালী দেবী

এইরূপ একটি বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। বিপ্লবী নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন মহান, মানুষ হিসাবে ছিলেন আরও সুমহীয়ান। মহত্ত্ব তিনি পেয়েছিলেন সহজাত সম্পদরূপে আপন বংশধারা থেকে। যৌবনে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন ভোলানন্দ গিরি মহারাজের কাছে। তাঁর উপাস্য গ্রন্থ ছিল গীতা।

বিংশ শতাব্দীর ভারতে এত বড় উদ্দাম যৌবন, এতখানি অকুতোভয়তা আর কোন মানুষের মধ্যে দেখা গিয়েছে বলে আমার জানা নেই। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' এবং 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—এই কবি-বাক্যগুলির এত জ্বলন্ত মূর্তিমান দৃষ্টান্তও বুঝি আর কোথাও দেখা যায়নি।

মাতুলালয়ে ছোট যতি দিন-দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার কচি মনের উপরে পড়তে লাগল পারিপার্শ্বিকের ছাপ আর প্রভাব। বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল জেলা-বোর্ডের রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে সকালবেলাতে কুষ্টিয়া থেকে আসত ডাক-হরকরা। যতির মামাবাড়িতেই ছিল গ্রামের ডাক-ঘর। ডাক-হরকরা কাঁধে ডাক-ব্যাগ বহন ক'রে, দক্ষিণ হস্তে একটি সড়কি নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হ'ত। তার সড়কির বাঁটে বাঁধা থাকত ঘুঙুর। দূর থেকে সেই ঘুঙুরের ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ শুনে যতি চকিত হয়ে উঠত আর ছুটে বাড়ির বাইরে বেল গাছটির তলে এসে দাঁড়াত। ডাক-হরকরা এই বেল-গাছটির তলেই তার ডাক-ব্যাগ নামাত; কপালের উপর থেকে তার বিস্রস্ত-ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ললাটের ঘর্ম মুছে ফেলত। যতির মেসোমশাই হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পোস্টমাস্টার আর

যতিদের পাড়ারই এক পরামাণিক ছিল পিওন। তাঁরা ডাক-ব্যাগ খুলে চিঠি-পত্র বার করে পরীক্ষা করে দেখতেন, গ্রামের লোকেরাও কেউ-কেউ এসে সেখানে জমায়েত হয়ে তাম্রকূট সেবন করতেন এবং তাঁদের প্রত্যাশিত পত্রাদির সন্ধান নিতেন। যতি এসে, একেবারে কাছ ঘেঁষে বসে ডাক-হরকরার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে দিত।

যতি জিজ্ঞাসা করে: "আচ্ছা ভুঁইমালী-দা, তুমি যখন গোট্রের ঘাট থেকে সকালবেলা একলা একলা আস, তখন যদি কুসোর-ক্ষেত (আখক্ষেত) থেকে বুনো শুয়োর বেরিয়ে তোমায় তাড়া করে, তা'হলে তুমি কি করবে?"

সেই বলিষ্ঠ ভীমকান্তি ভুঁইমালী ডাক-হরকরা হেসে সেই কৌতূহলী ছোট্ট শিশুটিকে বলে: "কেনে দাদাবাবু, আমি তার প্যাটের মুখ্যি আমার এই সড়কি ঢুকোয়ে দিয়ে তাইরে মাইরে ফ্যালাবো।" বলে আর ভুঁইমালী তার সড়কিটা তুলে নিয়ে একবার শূন্যে আন্দোলিত করে দেখায়।

যতি সেই সড়কিটা নিজের হাতে তুলে নেয় এবং সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরখ করে দেখে। সে পরখ করে আর জিজ্ঞাসা করে: "আচ্ছা ভুঁইমালী-দা, তোমার এই সড়কি দিয়ে বুনো শুয়োর, সজারু, নেকড়ে বাঘ—সব মারা যায়?"

ভুঁইমালী হেসে বুক ফুলিয়ে উত্তর দেয়: "যায় বৈকি দাদাবাবু।"

যতি আবার জিজ্ঞাসা করে: "তুমি মেরেছ কোন দিন?"

ডাক-হরকরা বলে: "মারব ক্যামুন কইরে? উয়ারা যে ঘুঙুরির শব্দ শুনে সব পলায়ে যায়, কাছে তো আসে না। কাছে আলি লিশ্চয় মারে দেব"—বলে সে একটা খুব বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী করে দেখায়।

যতির খুব আনন্দ হয়। সে কল্পনা করতে থাকে—কি করে হাতে একটা সড়কি থাকলে শুয়োর, সজারু ও বাঘ মারা যেতে পারে।

বালকের মনে ভাবান্তর হয়। পরক্ষণেই সে জিজ্ঞাসা করে: "আচ্ছা ভুঁইমালী-দা, সন্ধ্যার পরে যখন তুমি একলা ফিরে যাও, তখন বিন্দীপাড়ার ঘাটের কাছে তোমার ভয় করে না? শ্মশান থেকে ভূত-পেত্নীরা এসে যদি তোমার ঘাড় মটকে দেয়, তা'হলে কি করবে?"

ভুঁইমালী ডাক-হরকরা আবার হেসে যতিকে শুনায়: "ভূত-পেত্নী তো নেই দাদাবাবু! ওডা এট্টা মিছে কথা। কৈ আমি এ্যাদ্দিন যাচ্ছি-আসছি, কুন্নুদিন তো ভূত দেখতে পাইনি! ওসব কিচ্ছু নেই—সব বানানো কথা!"

বালক যতি ভাবতে শুরু করে—ভূত-পেত্নী-উপদেবতা বলে কিছু নেই, ও সব বানানো গল্প।

গ্রামের প্রান্তে গড়াই নদীর ওপরে ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল রেলওয়ের গড়াই-ব্রিজ। ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি ছুটে চলে যায়, বালকেরা বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। যতি মাঝে মাঝে অবাক বিস্ময়ে ভাবে—এত বিশাল অতল খরস্রোতা নদীর উপরে মানুষ কি করে এমন সাংঘাতিক মজবুত ব্রিজ গড়ে তুলল! সে মামীমা, পিসীমা, মাসীমাদের জিজ্ঞাসা করে—কি করে ব্রিজ গড়া হ'ল!

তাঁরা গল্প করে শুনান সেই বিস্ময়কর কাহিনী। সাহেবরা এল ব্রিজ গড়তে, হাজার-হাজার লোক লাগাল। খানিক গাঁথা হয়, আবার ভেঙ্গে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভীষণ লড়াই। স্রোতের ধাক্কায় যখন গাঁথুনী ভাঙ্গতে আরম্ভ করে, তখন মজুরেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। একবার মজুরেরা যখন এমনি করে প্রাণের

ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সাহেব রেগে গিয়ে যারা পালাচ্ছিল, তাদের গুলি করে মেরে ফেলল। দশ-বার জনকে সাহেব গুলি করে মেরে ফেলল আর চিৎকার করে বলল : 'পালিও না, গাঁথ, পালালেই মেরে ফেলব।"

কাহিনী শুনে যতি রাগে ফুলতে লাগে। 'কি এত স্পর্ধা, এত নিষ্ঠুরতা! এমনি করে সাহেবরা আমাদের গ্রামের নির্দোষী গরীব মজুরদের খুন করেছে? আচ্ছা, আমি বড় হয়ে এর শোধ নেব। গুলি করে আমি সাহেবদের মারব।"

বালক ভাবে, নিস্তব্ধ হয়ে ভাবে।

কৈশোর

বালক যতি এবার কৈশোরে উপনীত হয়েছে। দেহে তার জোয়ার বইতে শুরু হয়েছে। সুঠাম, বলিষ্ঠ, তেজোময় দেহ। পেশীগুলি বলিষ্ঠ সুপুষ্ট, আবেগে ঈষৎ চঞ্চল। ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত বক্ষ, সিংহগ্রীবা; সর্বদেহে পৌরুষের দৃপ্ত ভঙ্গী, অপরূপ লাবণ্য এবং অজস্র শক্তির যেন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। প্রশস্ত ললাটখানি ঢেকে প্রলম্বিত চাঁচর কেশ। দুটি ডাগর চক্ষু যেন রঞ্জিত হয়েছে অশনি-দীপ্তিতে। ছেলের দলের মধ্যে যতিকে দেখলে মনে হয় —যেন গুল্মরাজির মধ্যে উদয় হয়েছে এক বলিষ্ঠ ঋজু শিশু শাল-তরু।

চেহারাতেও যেমন স্বতন্ত্র, যতি স্বভাবেও তেমনি স্বতন্ত্র। দুঃসাহসের রথে চড়ে দুর্বার উল্কা-গতিতে ছুটে চলাতেই তার আনন্দ! বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে জেলা বোর্ডের সোজা দীর্ঘ সড়ক, কুষ্টিয়ার পরপার থেকে কুমারখালি পর্যন্ত। সেই রাস্তা দিয়ে যতি ঘোড়ায় চড়ে ছুটেছে। ঘোড়ার পিঠে জিন নেই, মুখে লাগামও নেই। অশ্বের নগ্ন পৃষ্ঠে বসে আছে যতি, বাঁ হাতে ঘোড়ার গ্রীবার ঝুঁটি চেপে ধরে ডান হাত আন্দোলিত করে ঘোড়াকে উৎসাহ দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়েছে সে, রাস্তা দিয়ে চলেছে যেন একটা ঘূর্ণীবায়ুর মত ছুটন্ত ধূলিরাশি, ঘোড়া বা ঘোড়ার সওয়ার ভাল করে দৃষ্টিগোচর হয় না—এমনি সেই ঘোড়-দৌড়! ঠিক যেন আরবের মরুভূমির বুক চিরে বেদুইন বালক বালি উড়িয়ে নক্ষত্রবেগে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে চলেছে।

ভরা বর্ষার ভরা গড়াই নদী উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। পাঁচ-ছয়

হাত উঁচু এক-একটা ঢেউ উঠছে আর সহসা যেন ফেটে গিয়ে বিকট গর্জনে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এর নাম মাথাভাঙা ঢেউ। যতি স্নান করতে নেমে মাঝ-দরিয়ায় চলে গিয়ে মনের আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভাঁটিয়ে যেতে লাগল। নাগরদোলার মত যতি কখনও ঢেউয়ের তলায় ডুবে যাচ্ছে, কখনও-বা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠছে। সাঁতার দিতে-দিতে মাঝ-দরিয়া দিয়ে যতি চলেছে, তু'পাশে এক-এক মাইল দূরে-দূরে তট, সাঁতার দিতে দিতে যতি কয়া থেকে সাত মাইল দূরে কুমারখালি গিয়ে উঠল।

পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোৎস্নায় ফটিক ফুটছে। মধ্য রাত্রে যতি সড়কি হাতে ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটেছে এক পাল বন্য সজারুর পিছনে-পিছনে। প্রাণভয়ে বন্য পশুরা ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ করতে-করতে নক্ষত্রবেগে ছুটেছে আত্মরক্ষা করতে, আর যতি পরমোল্লাসে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছে শিকারের উত্তেজনায়।

এনট্রান্স পাশ করে যতি কলকাতায় সেণ্ট্রাল কলেজে এফ-এ পড়ছে তখন। একদিন ছুটির সময়ে সে কৃষ্ণনগরে বেড়াতে বেরিয়েছে। বাজারের মধ্য দিয়ে যখন সে যাচ্ছে, চারিদিকে তখন হৈ-হৈ শব্দ। দোকানীরা তাড়াতাড়ি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে, পথচারী মানুষ ভয়ে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। যতিকে দেখে, অলিন্দ থেকে শত-কণ্ঠে ভীতি-চকিত নরনারী চিৎকার করে উঠল, "পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, একটা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়!"

যতি থমকে দাঁড়াল, ব্যাপারখানা কি?

রাজবাড়ির একটা বিরাট ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, আর ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেই ক্ষিপ্ত অশ্বের ভয়ে সবাই রাস্তা থেকে পালাচ্ছে, দোকান

বন্ধ করে দিচ্ছে। যতি রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তার চারদিক হ'তে শত-শত ভয়ার্ত কণ্ঠের অনুরোধ আসতে লাগল: "পালাও, পালাও।"

যতি পালাল না, দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার উপরে। পরক্ষণেই দেখা গেল—দূরে সেই বিরাটকায় ক্ষিপ্ত তুরঙ্গম তীব্র গতিতে এইদিকে ছুটে আসছে। যতি তাড়াতাড়ি মালকোঁচা বেঁধে, শার্টের হাতার আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে ছাদের উপর থেকে সহস্র-সহস্র বিস্মিত বিহ্বল চক্ষু চেয়ে রইল তার প্রতি। দুরন্ত অশ্ব দড়-বড়, দড়-বড় শব্দে রাস্তার ধুলিরাশি উড়িয়ে ছুটে আসছে। যখন সে একান্ত নিকটে এসে পড়েছে, যতি সহসা এক লম্ফে রাস্তার মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়ে, দুই হাত প্রসারিত করে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আচম্বিতে সম্মুখে এইরূপ বাধা পেয়ে ঘোড়াটাও বিহ্বল হয়ে সহসা থমকে দাঁড়াল। ঘোড়া যেমনি থামল, যতি হুঙ্কার করে লাফিয়ে উঠে তার কপালের ঝুঁটি বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল। ঘোড়া তখন পিছ-পা করে মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল আর ভীষণ ক্রোধে চিঁহি-হি রবে গর্জন করতে লাগল। যতিও দুই হাতের মুষ্টিতে ঘোড়ার ঝুঁটি চেপে ধরে ঝুলতে লাগল আর চিৎকার করতে লাগল, "দড়ি নিয়ে এসে বেঁধে ফেল, দড়ি নিয়ে এসে বেঁধে ফেল।" এমনি ভাবে খানিকক্ষণ ধরে চলল ঘোড়া আর মানুষের ধ্বস্তাধ্বস্তি। কিছুক্ষণ পরে যতি দুই বাহু দিয়ে ঘোড়ার গ্রীবা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল আর প্রবল শক্তিতে চাপ দিতে লাগল। সেই প্রবল চাপের পেষণে ঘোড়া কাবু হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তখন চারিদিক হ'তে জনতা বেরিয়ে এসে দড়ি দিয়ে ঘোড়াটাকে বেঁধে ফেলল।

বৈকালের এই ঘটনা সন্ধ্যার মধ্যেই মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল

দারা কৃষ্ণনগর শহরে। শহরময় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল গভর্ণমেণ্ট-প্লীডার বসন্তবাবুর ভাগিনেয় যতির অদ্ভুত সাহস আর শক্তির কাহিনী। স্বয়ং মহারাজা, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব থেকে আরম্ভ করে শহরের সমগ্র গণ্যমান্য এবং আপামর জনসাধারণের আন্তরিক অভিনন্দন বর্ষিত হ'তে লাগল যতি এবং বসন্তবাবুর উপর।

সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্বে এক নব-ঘন-শ্যামমূর্তি কিশোর বীর এক দুরন্ত মহাসর্পকে হেলায় দমন করে যেমন সমগ্র বৃন্দাবনবাসীর অন্তরের অভিনন্দন অর্জন করেছিল, ঠিক তেমনি যেন এই উজ্জ্বল শ্যামবরণ কিশোর বীর এক দুর্জয় দুরন্ত অশ্বকে দমন করে আজ সারা নদেবাসীর অভিনন্দন আর অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাণ্ডার দখল করে বসল।

যৌবন

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যখন যতীন্দ্রনাথ উপনীত হলেন, তখন তাঁর অন্তরের মধ্যে এসে পৌঁছুতে লাগল এক অভিনব অপূর্ব সাগর-সঙ্গীত। যতীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন না—এ কার সঙ্গীত, কোথাকার সঙ্গীত, কেবল সম্মোহিত হয়ে যান, তন্ময় হয়ে যান সেই দূরাগত অস্ফুট সঙ্গীত অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। নদীর মোহানা যেমন দূরাগত সমুদ্রের কল্লোল শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে, আর তীব্র গতিতে চঞ্চল নৃত্যে সম্মুখে ছুটে চলে, যতীন্দ্রনাথ তাঁর বয়ঃসন্ধিকালে তেমনি অহরহ শুনতে আরম্ভ করলেন তাঁর অন্তরের মধ্যে কি যেন এমনি এক সাগর-সঙ্গীত। এই অস্ফুট সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁকে কেবলি উন্মাদ উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলতে লাগল, কি এক চাপা শিহরণ তাঁর দেহে আর মনে নিরবচ্ছিন্ন ফুটে উঠতে লাগল। কস্তুরী-মৃগ যেমন আপন কস্তুরী-সৌরভে উন্মনা ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অস্থির চাঞ্চল্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে বেড়ায়, যতীন্দ্রনাথের মনও তেমনি আপন, কস্তুরী-সৌরভে উন্মনা হয়ে নিরন্তর এক অস্থির চাঞ্চল্যে দুলতে আরম্ভ করল।

এই সঙ্গীত আর সৌরভ তাঁর উন্মেষোন্মুখ যৌবনের আগমনী। এত বড় যৌবন ভারতবর্ষের ইতিহাসে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দেখা যায়নি। যাঁরা সেই বিপুল দুর্বার যৌবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরাই শুধু ধন্য হয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি অপরূপ ছিল তা'। কিন্তু আমি আজ পাঠক-পাঠিকাকে কি করে যতীন্দ্রনাথের সেই অতুলনীয় যৌবনের মহিমা বোঝাব? সে যে অনির্বচনীয়, অচিন্তনীয়। গভীর উপলব্ধির দ্বারা মাত্র তাকে অনুভব করা যায়,

বর্ণনা করে ব্যক্ত করবার মত বিষয় তা নয়। আর যতটুকুই বা তার বর্ণনা করা যায়, তারই বা শক্তি আমার কৈ? আজ লেখনী হস্তে বসে-বসে নিজের লেখনীর অক্ষমতা ও দুর্বলতা যতখানি স্পষ্ট করে অনুভব করছি, এমন বুঝি আর কখনও করিনি!

ভারত ইতিহাসের ত্রেতাযুগের অচিন্তনীয় যৌবন-বিগ্রহের বর্ণনা করে মহাকবি ভট্টি লিখেছিলেন:

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি"

আর একস্থানে সেই যৌবনের মহাশৌর্য ও তেজের বর্ণনা করে ভট্টি লিখে গেছেন—

"বলির্ববন্ধে, জলধির্মমন্থে"

এমনই যৌবন ছিল যতীন্দ্রনাথের। বজ্রের মত দৃঢ় অথচ কুসুমের মত কোমল একটি মর্ম নিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। বলীর মত মহাবীরকে তিনি যেন হেলায় পরাভূত করতেন, জলধিকে তিনি যেন মন্থন করতেন উচ্ছল আনন্দে।

মৈত্রেয়ী যেদিন দৃপ্তচক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "যে সম্পদ আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারবে না, কি ক'রব আমি সে সম্পদ নিয়ে?"

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহম তেন কুর্য্যাম্"?

অনিত্য সংসার-সম্পদের প্রতি নিরাসক্ত সেই বাঁধনছেঁড়া যৌবন ছিল যতীন্দ্রনাথের।

যে দুর্বার যৌবন নিয়ে বালক বাবর সিন্ধুনদ সন্তরণে অতিক্রম করতেন, আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয় করতেন, যে যৌবনের প্রেরণায় অশীতিপর বৃদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর পদব্রজে হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে যাত্রা করেছিলেন, সেই অপরূপ যৌবন নিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। যে যৌবন নিয়ে ছত্রপতি শিবাজী অশ্বপৃষ্ঠে উল্কাগতিতে

মহারাষ্ট্রের পর্বতশৃঙ্গমালা উল্লঙ্ঘন করে মাওয়ালী সেনাদল গঠন করে বেড়াতেন, যে যৌবনের অপরাজেয় মনোবল নিয়ে রাণাপ্রতাপ পর্বতের কন্দরে-কন্দরে আত্মগোপন করে মুঘল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতেন, সেই অপরাজেয় যৌবন নিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। যে যৌবনের উদারতায় নিমাই পণ্ডিত সতীর্থ রঘুনাথের মলিন বদন দেখে স্ব-রচিত অমূল্য ব্যাকরণের টীকাখানি তুচ্ছ সামগ্রীর মত সুরধুনীর জলে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিশোর শাক্যসিংহ বাণবিদ্ধ কপোতীর যন্ত্রণা নিজে অনুভব করার জন্য নিজ হাতে শাণিত তীরটি নিজের পেলব করে বিদ্ধ করেছিলেন, সেই উদার যৌবন নিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। শৌর্য, বীর্য, সাহস, ত্যাগ, প্রেম, করুণা ও দেশ-প্রীতির যে চূড়ান্ত অপূর্ব সমাবেশ হয়েছিল তাঁর চরিত্রে, এমনটি ভারতের ইতিহাসে বহুদিন বুঝি দেখা যায়নি। এত বড় যৌবন ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বোধহয় জন্মায়নি।

কত বড় দুর্ভাগ্য সে দেশের, যে দেশের লোক যতীন্দ্রনাথের অতি সামান্যমাত্র পরিচয়ই রাখে। দেশ তাঁকে কতটুকু জেনেছে? কতটুকু উপলব্ধি করেছে? পরাধীন দেশের তিনি ছিলেন বিপ্লবী নেতা। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল গুপ্ত সমিতির রন্ধ্রের ভিতরে; অতএব জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন অজ্ঞাত। ইংরেজ তাঁর মহাপ্রয়াণের পরেও তাঁর স্মৃতি প্রাণপণ শক্তিতে অবলুপ্ত করার চেষ্টা করেছে। ফলে জনসাধারণ তাঁকে জানতে পারেনি, তাঁর পূর্ণ পরিচয় পায়নি।

আজ স্বাধীনতোত্তর ভারতে জনসাধারণের কাছে তাঁর নামকরণ হয়েছে "বাঘা-যতীন"। হায়-রে, এর চেয়েও তাঁর দীনতম প্রকাশ কি হ'তে পারে? গ্যারিবল্ডীর চেয়েও যাঁর দুঃসাহস ছিল বড়, হিটলারের চেয়েও যিনি ছিলেন অধিকতর দুর্বার, বিসমার্কের চেয়েও

কুশলী ডিপ্লোম্যাট, সংগঠন শক্তিতে অদ্বিতীয়—সহকর্মী সতীর্থ এবং মানুষ মাত্রেরই প্রতি প্রীতি এবং করুণায় বিগলিত বিশাল হৃদয় তাঁর, দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে তাঁর অভিনব আত্মাহুতি, যার তুলনা-উপমা সত্যই বিরল ভারতের ইতিহাসে—সম্মিলিত বিপ্লবী দলের সেই সার্বভৌম সর্বাধিনায়ককে দেশ কতটুকু চিনল, কতটুকু উপলব্ধি করল ? বাঘা-যতীন আখ্যার ভিতর দিয়েই কতটুকুই বা তাঁর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় ? এই যৌবনের প্রথম উন্মেষ যেদিন আরম্ভ হতে লাগল বয়ঃসন্ধিক্ষণে তাঁর জীবনে, সেদিন যতীন্দ্রনাথ অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে লাগলেন এক অপূর্ব অনুভূতি—কেমন যেন একটা মদির, নিবিড়, সুন্দর অনুভূতি ! যতীন্দ্রনাথের এই সময়কার অনুভূতির কথা আমি দিদিমার কাছে শুনেছি। দিদিমা বলতেন : "যতি যেন এই সময় কেমন-কেমন হয়ে উঠল। তার চোখে-মুখে-কপালে যেন কেমন একটা অপূর্ব আবেশের আবীর মাখান থাকত। নূতন বৌ স্বামীর সোহাগ পেয়ে যেমন একটা অদম্য পুলক-চাঞ্চল্য-শিহরণ সর্বাঙ্গে অনুভব করে, চেষ্টা করেও তাকে সম্বরণ করতে পারে না, অপরের চক্ষুতে ধরা পড়ে যায়, যতির মধ্যেও একটা সেই রকম অবস্থা দেখতে পেতাম। একদিন কুষ্টিয়া থেকে বাড়ি আসবার জন্য যতি কুষ্টিয়ার ঘাটে নৌকাতে চড়েছে, আমাদের গ্রামের আরও কয়েকজন লোক সেই নৌকাতে ছিল, নৌকা তখনও ছাড়েনি—একটি পরিচিত দুঃখী ভিখিরী এসে সকলের কাছে ভিক্ষে চাইত লাগল। দুটো একটা পয়সা অনেকের কাছেই সে পেল। যতির পরণে ছিল সেদিন সদ্য-কাচা কোট-প্যাণ্টের স্যুট। ভিখিরীটি এসে যতির কাছে ভিক্ষে চাইল : "দাদাবাবু, আমাকে তোমার একটা পুরনো কাপড় দেবে ? দেখ, আমার কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে, গেরো দিয়ে দিয়ে আর পরা যায় না !" যতি তার দিকে চেয়ে, তার শতছিন্ন বস্ত্রখানি

দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল! পকেটে হাত দিয়ে যা ছিল, সব বের করে দেখল—একটা দশ টাকার নোট আর কিছু রেজগি পয়সা আছে; যতি আবেগের সঙ্গে তার হাত দুটো ধরে সেই হাতে নোট আর পয়সা সব গুঁজে দিয়ে বলল, "না না গোবিন্দ, পুরনো নয়, পুরনো নয়, তুই এই দিয়ে ভাল নূতন কাপড় কিনে নিস্।"

আর একদিন যতি কুষ্টিয়া থেকে গোড়ের ঘাটে খেয়া পার হয়ে বাড়ি আসছে; সূর্য তখন অস্ত গেছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। নৌকা থেকে নামতেই দেখে—একটি মুসলমান বুড়ী এক বোঝা ঘাস কেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাটা অনেক বড় হয়ে গেছে, সে তুলতে পারছে না, আবার ঘাসের বোঝাটা ফেলে রেখেও বাড়ি যেতে পারছে না, হয়ত চুরি হয়ে যেতে পারে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে বুড়ী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সে সকলকে আকুলভাবে অনুরোধ করছে, "ওগো, তোমরা কেউ ঘাসের বোঝাটা আমার মাথায় তুলে দাও না-গো!" কিন্তু বুড়ীর ঘাসের বোঝাতে এত জল-কাদা লেগে আছে যে, সেই বোঝা তুলে দিতে গেলেই গায়ে সেই জল কাদা লেগে যাবেই, তাই কেউ আর বুড়ীর বোঝাটা তার মাথায় তুলে দিতে রাজী হচ্ছে না। যতিকে দেখে বুড়ী বলে উঠল: "সাহেব বাবু, সাঁঝ হয়ে গেল, আমার বোঝাটা তুলে দাও না-গো!" যতির পরণে ছিল ঝকঝকে স্যুট। যতি অসঙ্কোচে ঘাসের বোঝাটা দু'হাতে উঁচু করে তুলে ফেলল, কিন্তু তুলে'ই বুঝল যে, অত ভারী বোঝা বুড়ীর মাথায় চাপিয়ে দিলে বুড়ীর ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। যতি স্বচ্ছন্দ মনে ঘাসের বোঝাটি নিজের কাঁধে তুলে নিল। ঝকঝকে কোট-প্যাণ্ট মুহূর্তেই কর্দম-কলঙ্কিত হয়ে গেল। যতির সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বললে: "বুড়ি, এত বড় বোঝা তুই নিতে পারবি নে, চল্ আমি তোর বাড়িতে দিয়ে আসি।" বুড়ী তখন সঙ্কোচে

কুণ্ঠায়, লজ্জায় ও অনুতাপে খালি "ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা" বলতে লাগল। যতি বুড়ীর কোন অনুনয়-নিবারণ শুনল না, তার হাত ধরে, তার ঘাসের বোঝা মাথায় করে প্রায় এক মাইল পথ হেঁটে তাকে ও তার ঘাসের বোঝাটিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল। আসবার সময়ে বুড়ীর হাতে যতি গোটা কয়েক টাকাও দিয়ে এল।

একবার হরিসভাতে কীর্তন হচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাস, বেলাও প্রায় বারটা। কিন্তু কীর্তন খুব জমে উঠেছে। কথক ঠাকুর রাধারমণ গোঁসাই তদ্‌গত ভাবে গান করছেন ঃ

"হরি এবার তোমায় আসতে হবে হে,
নৈলে তোমার ভক্ত মরে—
এবার তোমায় আসতে হবে হে !"

হরিসভায় লোকে-লোকারণ্য। রৌদ্রে সবাই পুড়ে যাচ্ছে, তবু গান ছেড়ে কেউ উঠছে না। হঠাৎ ডাঃ যুধিষ্ঠির বিশ্বাস (জাতিতে জেলে, বড় হরিভক্ত) ভাবোন্মাদ হয়ে লাফিয়ে উঠল আর হুঙ্কার করে, "প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ" বলে চিৎকার করতে করতে বালির চড়ায় গিয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। সমস্ত শরীরে তার দরদর ধারায় ঘাম বইতে লাগল আর তপ্ত বালিতে পা পুড়ে যেতে লাগল ; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের তখন বাহ্যজ্ঞান নেই, সে কেবলি 'প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ' রবে চিৎকার করছে। যতি ছুটে এক বালতি জল নিয়ে এসে যুধিষ্ঠিরের পায়ের তলায় জল ছিটিয়ে দিতে লাগল আর তার পিছনে-পিছনে ঘুরে-ঘুরে একটা পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল। দু'জনেরই তখন ভাবোন্মাদ অবস্থা, একজন

প্রাণপণে 'প্রাণ-গৌরকে' ডাকছে, আর একজন প্রাণপণে গৌরভক্তের সেবা করছে।"

আমার দিদিমা বলতেন, "যতি যে সাধারণ মানুষ নয়, এই সময়ে তা বুঝতে পারতাম। সে যেন সর্বদাই বহু দূরের কি-এক বাঁশীর ডাক শুনতে পেত। চোখে-মুখে মাঝে-মাঝে কি এক অপরূপ জ্যোতি ফুটে উঠত, কেমন যেন উন্মনা হয়ে সে থাকত। কিসের যেন আনন্দে থেকে-থেকে চমকে-চমকে উঠত। বিজয়া-দশমীর পরে যতি কোলাকুলি করতে বেরিয়ে সকলকে আলিঙ্গন করত। জোলা, বিন্দী, ভূঁইমালী, কুরি, মুচি—কাকেও সে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন না করে ছেড়ে দিত না।"

যতীন্দ্রনাথের দৈহিক বল ছিল অসাধারণ আর মনের বল ছিল অতিমানবিক। এই অসাধারণ দৈহিক বল আর অতিমানবিক মনের বল একত্র করে তিনি অবলীলাক্রমে খেয়ালের বশে অথবা লীলাচ্ছলে যে সকল কাজ করতেন, সাধারণ মানুষ সে-সব দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যেত।

একদিন কলকাতা থেকে কয়ার বাড়িতে আসছেন। বর্ষাকাল, গড়াই নদী জোর বাতাসের আলিঙ্গন পেয়ে একেবারে রণ-রঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করেছে। চাটগাঁ মেল ট্রেন কুষ্টিয়া স্টেশনে এসে থামল, যতীন্দ্রনাথ চেয়ে দেখলেন—নদীর ঘাটে একখানিও নৌকা নেই। নদীর এপারে কুষ্টিয়া স্টেশন আর ওপারে কয়া গ্রাম, কুষ্টিয়া স্টেশনে নেমে নৌকায় নদী পার হয়ে কয়ায় যেতে হয়। নদীতে নৌকা নেই দেখে যতীন্দ্রনাথ নামলেন না, ট্রেনেই বসে রইলেন। খানিকক্ষণ পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল এবং দশ মিনিটের মধ্যেই গড়াই ব্রিজ পার হয়ে গেল। চাটগাঁ মেল তখন ঘণ্টায় ৪৫ মাইল গতিতে ছুটছে, তার পরের স্টপেজ স্টেশন একেবারে 'রাজবাড়ি', ওখান থেকে

মাইল ষোল দূরে, মধ্যে চড়াইখালি, কুমারখালি, খোকশা প্রভৃতি স্টেশনে এ ট্রেনখানি থামে না। ট্রেন গড়াই ব্রিজ পার হয়ে গেলেই যতীন্দ্রনাথ কামরার দরজা খুলে ফুট-বোর্ডর উপরে হাতলটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন আর যেই ট্রেনখানি কয়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সেই জেলাবোর্ডের প্রশস্ত রাস্তাটি অতিক্রম করবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি লাফিয়ে নেমে পড়লেন।

কলকাতার অভ্যস্ত মানুষেরা যেমন চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়ে, যতীন্দ্রনাথ ঠিক তেমনি এই ৪৫ মাইল বেগে ধাবিত চাটগাঁ মেল-ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন এবং জেলা-বোর্ডের রাস্তা ধরে মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ি এসে পৌঁছলেন।

এর পর থেকে যতীন্দ্রনাথ প্রয়োজন হ'লে বরাবরই এই কার্য করতেন। চলন্ত চাটগাঁ মেল ও ঢাকা মেল-ট্রেন থেকে তিনি টুক্ করে লাফিয়ে নেমে পড়তেন।

সকালে চুয়াডাঙ্গা থেকে সাইকেলে চড়ে তিনি রওনা হলেন, এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছুলেন ঝিনেদা শহরে—দূরত্ব বাইশ মাইল। এক কাপ চা খেতে-খেতে একজনের সঙ্গে (বিখ্যাত বিপ্লবী কর্মী শ্রীবিভূতিভূষণ দেবরায়) কথা বলে তিনি তখনি রওনা হলেন যশোর। ঝিনেদা থেকে যশোর ২৮ মাইল রাস্তা। যশোরেও ৫।৭ মিনিট কথাবার্তা বললেন বিজয় রায়ের সঙ্গে (অধুনা লোকান্তরিত বিপ্লবী নেতা)। কিন্তু যার সঙ্গে বেশী প্রয়োজন, সেই সত্যেন সেন (লোকান্তরিত বিখ্যাত বিপ্লবী কর্মী, ইনি বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে পরে আমেরিকা গিয়েছিলেন) রয়েছেন মাগুরাতে। অতএব তিনি তখনি ছুটলেন মাগুরা—আবার ২৮ মাইল দূরে। মাগুরাতে পৌঁছে তিনি শুনলেন যে, সত্যেন সেন, তিনি আসছেন

এই সংবাদ পেয়ে, তাঁরই সঙ্গে দেখা করবার জন্মই একটু আগে সাইকেলে ঝিনেদা রওনা হয়েছেন। যেমনি এই সংবাদ পেলেন, অমনি যতীন্দ্রনাথ অবিলম্বে আবার পাড়ি দিলেন ঝিনেদার দিকে। মাগুরা থেকে ঝিনেদা ১৭ মাইল, তিনি ছুটলেন নক্ষত্রগতিতে। সত্যেন ঝিনেদা পৌঁছবার আগেই তাকে ধরে ফেলতে হবে, নইলে তিনি যদি আবার তাঁকে খুঁজতে যশোরের দিকে পাড়ি দেন? যতি সাইকেল ছুটিয়েছেন খুব জোরে, কিন্তু সত্যেনকে ত ধরতে পারছেন না, মধুপুরের হাটতলা পার হয়ে এলেন—ঝিনেদা আর মাত্র চার মাইল, কিন্তু কৈ সত্যেন? আরও জোরে—আরও জোরে—আরও জোরে তিনি ছোটালেন সাইকেল; এলং ধোপাঘাটার পোল—ঝিনেদা আর মাত্র দুই মাইল, কিন্তু কৈ সত্যেন? আরও জোরে—আরও জোরে—সাইকেল ভেঙ্গে যাবে না ত? ঝিনেদা আর মাত্র দু' মাইল, রাস্তাটা এখানে খুব ভাল, দু' পাশে বড়-বড় ঝাউ গাছ রৌদ্র নিবারণ করছে; ঐ দূরে কে একজন সাইকেল চড়ে যাচ্ছে না! আগের সাইকেলটা ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছে। হাঁ, ঐ ত সত্যেন! ব্যস্, আর কোথায় যায়! ঝিনেদা শহরের একেবারে প্রান্তে টুইডি স্পোর্টিং গ্রাউণ্ডের কাছে এসে যতি ধরে ফেললেন সত্যেন সেনকে। সত্যেনকে সঙ্গে করে তিনি বসালেন মাঠের ধারে, ঝাউগাছ তলাতে কথাবার্তা বললেন তাঁর সঙ্গে; তার পরে দু'জনে এসে পোস্ট অফিসের ধারে চক্রবর্তী মশায়ের খাবারের দোকানে বসে উভয়ে পেট ভরে কাঁচাগোল্লা সন্দেশ খেলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে সাইকেল নিয়ে তিনি আবার পাড়ি দিলেন চুয়াডাঙ্গাতে, আবার ২২ মাইল। চুয়াডাঙ্গাতে এসে বৈকাল ৫টার সময়ে ডাউন চাটগাঁ মেল-ট্রেন ধরে তিনি কলকাতা রওনা হলেন।

পরবর্তী যুগে, গান্ধী আন্দোলনের যুগে, এই সত্যেন সেন আর এই বিভূতি দেবরায় হয়েছিলেন আমাদের ক্যাপ্টেন সত্যেন-দা আর বিভূদি-দা। সত্যেন-দার নিজের মুখে এই কাহিনী শুনেছি। সত্যেন-দা সেদিন বলেছিলেন, "দাদা (যতীন্দ্রনাথ) কি আমাদের মতন মানুষ ছিলেন রে? দাদা ছিলেন এ যুগের অর্জুন!"

শুনেছি সকাল থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত একটানা ভাবে অশ্বারোহণ কিংবা বাইসাইকেল চালান অথবা হাঁটা বা সন্তরণেও যতীন্দ্রনাথ অবসন্ন হতেন না। তাঁর দেহের সমস্ত স্নায়ু ও পেশীতন্তুতে বল এবং কর্মশক্তি যেন অফুরন্ত ভাবে বিন্যস্ত ছিল। আর তাঁর মনের বল ও সাহসের যথাযথ বর্ণনা দেওয়া এক প্রকার অসাধ্য।

একদিন গভীর রাত্রে জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যতি বাড়ি আসছেন। কাঁধে তাঁর বন্দুক আছে। একটা জায়গায় এসে ঘোড়া ভীত চকিত হয়ে থেমে গেল, কিছুতেই আর এগুতে চায় না। যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন নিকটে কোথাও কোন জন্তু আছে। চারিদিকে দৃষ্টি ফেরাতে-ফেরাতে দেখলেন—অদূরে এক বাঘিনী নিজের কচি বাচ্ছাদের নিয়ে খেলা করছে। বাচ্ছাগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হ'ল তাঁর। তিনি রুমাল দিয়ে ঘোড়ার চোখ বেঁধে দিয়ে তাকে ধীরে-ধীরে সম্মুখে চালাতে লাগলেন। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন এবং বাঘিনীকে অন্ধকারে তার দুই জ্বলন্ত চোখ দেখে কপালে টিপ করে গুলি ছুঁড়লেন। সেই অব্যর্থ সন্ধানের একটি বুলেটেই বাঘিনীর মস্তক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথ তিনটি বাচ্ছাকে চাদরে করে বেঁধে নিয়ে এলেন।

বন্দুক, রিভলবার ও পিস্তল-চালনায় তিনি ছিলেন সত্যই সব্যসাচী। তাঁর শিকারকে তিনি কখনও একটি বই দুটি বুলেট

মারতেন না। আর পাখি, খরগোশ প্রভৃতি শিকারও তিনি করতেন না। তিনি শিকার করতেন বাঘ, বুনো শুয়োর আর নদীর প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড নরখাদক কুম্ভীর।

তাঁর অগ্নি-নালিকার সন্ধানও ছিল যেমন অব্যর্থ, তেমনি তাঁর বজ্রমুষ্টি ঘুঁষির ওজনও ছিল বিরাশী-সিক্কা। সে ঘুঁষিতে অনেকবার অনেক ষণ্ডাগুণ্ডার নাক ভেঙ্গেছে, কপাল ফেটেছে।

পঞ্চম জর্জের সিংহাসন আরোহণোপলক্ষে সারা কলকাতা শহর আলোক-সজ্জায় ও বাজির রোশনাইয়ে "রৌদ্রময়ী রাত্রির" রূপ ধারণ করেছিল। সেই আলোকমালা আর বাজি পোড়ান দেখবার জন্য ঘরের ভিতরকার সমস্ত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। যতীন্দ্রনাথ ক্যানিং স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন যে, একটি বাঙালী পরিবারের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা একখানি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বাজি পোড়ানো দেখবার জন্যে ময়দানের দিকে যাচ্ছেন। মহিলারা গাড়ির ভিতরে আছেন। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। কয়েকজন কাবুলীওয়ালা কোন খালি গাড়ি না পেয়ে অবশেষে সেই গাড়িতে উঠল, বলপ্রয়োগে গাড়ির ছাদের উপরে উঠে পা ঝুলিয়ে দিল, আর তাদের নাগরা-পরা পাগুলো জানালার ধারে মহিলাদের মুখের কাছে ঝুলতে লাগল। রাস্তার অগণিত লোক এই দৃশ্য দেখে হাসতে লাগল। গাড়ির ছাদের ভদ্রলোকেরা কাবুলীওয়ালাদের এই ইতর জুলুমের জন্যে মৌখিক প্রতিবাদ করলেন; কিন্তু কাবুলীওয়ালারা গ্রাহ্য করলো না, গ্যাঁট হয়ে পা ঝুলিয়ে বসেই রইল।

যতীন্দ্রনাথ আর সহ্য করতে পারলেন না। একলাফে তিনি চলন্ত গাড়ির কোচবাক্সের উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন, তার পরেই সেই আফগান পুঙ্গবদের নাকের উপরে পড়াম্-পড়াম্ ঘুঁষি। মিনিট

দুই-তিনের মধ্যেই আফগান বীরগণ গাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে সটান "বিপদের কালে বাঙালীরই মত চম্পট পরিপাটি" লাগাল। গাড়ির ভদ্রলোকেরা অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যতীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন, "থামুন মশাই থামুন, আর ধন্যবাদ দিতে হবে না। ক্লীব নাকি আপনারা? মা-বোনের মান-সম্মান যদি রক্ষা করতে না পারেন, তা'হলে মা-বোনকে রাস্তায় বার করবেন না—" বলেই তিনি হনহন করে নিজের পথে চলে গেলেন।

ফোর্ট উইলিয়মের কাছে গোরা-বাজারে গোরাপল্টনরা দেশীয় দোকানদারদের উপরে অনেক দুর্ব্যবহার করত, অনেক সময়ে তাদের ছড়ি দিয়ে মার লাগাত। একদিন যতীন্দ্রনাথ গোরা-বাজারে গেছেন, এক জায়গায় দেখলেন একটি পল্টনের গোরা আমোদ করে তার হাতের ছড়ি দিয়ে দোকানদারদের মাথায় ছিপটির ঘা মারছে আর "ওয়ান," "টু," "থ্রী," "ফোর" করে গুণছে। গোরাটি ছিপটি মারতে-মারতে "ফরটি এইট" অবধি গুণেছে, এমন সময়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর সামনাসামনি হলেন। সাহেব যেই "Forty eight" বলে একজনের মাথায় মেরেছে, যতীন্দ্রনাথও সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন: "Now your turn, fortynine—" এই ব'লেই তিনি তার নাকের উপর মারলেন এক ঘুঁষি। একটি ঘুঁষিতেই গোরা সাহেব ধরাশায়ী হলেন, আর যতীন্দ্রনাথও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

যতীন্দ্রনাথ তখন বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার। সরকারী কাজে দার্জিলিং যাচ্ছেন।

শিলিগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। কামরার ভিতরে একটি অসুস্থা বাঙালী ভদ্রমহিলা পিপাসায় জল খেতে চাইলেন, তাঁর স্বামী পানি-পাঁড়েকে ডেকে-ডেকেও পেলেন না। দেখে যতীন্দ্রনাথ তাঁদের ঘটিটা নিয়ে ছুটে চললেন প্লাটফরমের অপর প্রান্তে অবস্থিত জলের কল থেকে জল সংগ্রহ করতে। যতীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্ছেন জল আনতে, অন্যদিকে হুঁশ নেই। আট জন মিলিটারি সাহেব প্লাটফরমের উপর দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন আর সিগারেট টানছিলেন। ছুটে যেতে তাদেরই একজন সাহেবের গায়ে একটু ধাক্কা লেগে গেল। যতীন্দ্রনাথ থেমে বললেন: "I am sorry"; কিন্তু সাহেবটি এই সৌজন্যের প্রতি গ্রাহ্য না করে তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে যতীন্দ্রনাথের পিঠের উপরে শপাং করে বাড়ি কশিয়ে দিলেন। পলকের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের চোখে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু তিনি কিচ্ছুটি না বলে সাহেবদের দিকে একবার মাত্র চেয়েই ছুটলেন জলের কলের দিকে। কল থেকে জল নিয়ে কামরাতে এসে ভদ্রমহিলার স্বামীর হাতে ঘটিটা দিয়ে এগিয়ে চললেন সেই মিলিটারি সাহেবদের দিকে। এইবারে তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল, সমস্ত দেহটা ক্রোধে কুঁচকে-কুঁচকে উঠতে লাগল। সাহেবদের সামনে এসেই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন: "Now remember your God" বলেই মারলেন তার নাকে এক ঘুঁষি, যে তাঁকে মেরেছিল। ঘুঁষি খেয়ে সে সত্য-সত্যই "My God" বলে'ই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে; নাক দিয়ে তার দর-দর করে রক্ত পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বাকী সাত জন সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়ল যতীন্দ্রনাথের উপরে—তিনিও দুই হাতে চালাতে লাগলেন ঘুঁষির পর ঘুঁষি সেই সাতজনের নাকে, বুকে আর থুতনিতে। একদিকে সাতটি মিলিটারি গোরা আর একদিকে

এক বাঙালী যুবক—হাতাহাতি যুদ্ধ। প্লাটফরমের উপরে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, ট্রেনের সমস্ত যাত্রী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেই লড়াই দেখতে লাগল।

মারামারিতে যতীন্দ্রনাথ অবশ্য যথেষ্ট আহত হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি সেই সাতটিকেই ঘুঁষির চোটে বসিয়ে দিয়েছিলেন। যখন সাহেবরা আহত ও অবসন্ন হয়ে প্লাটফরমের উপরে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল, তখন ইয়োরোপীয়ান স্টেশন-মাস্টার পুলিস নিয়ে এসে যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাঁকে জানালেন: "আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার, সরকারী কাজে দার্জিলিং যাচ্ছি, অতএব তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পার না—এই নাও আমার কার্ড আর দার্জিলিং-এর ঠিকানা, পরে আমার নামে তুমি কোর্টে প্রসিকিউশন এনো।" স্টেশন-মাস্টার যতীন্দ্রনাথের কার্ড দেখে এবং হুইলার সাহেবের চিঠি দেখে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেই ট্রেনেই দার্জিলিং চলে গেলেন। মারামারির ফলে ট্রেন অনেকক্ষণ শিলিগুড়ি স্টেশনে লেট হয়েছিল।

এদিকে ঐ আট জন মিলিটারী সাহেব আদালতে যতীন্দ্রনাথের নামে মামলা রুজু করে যতীন্দ্রনাথকে সমন পাঠিয়ে দিল। হুইলার সাহেব সব শুনে ঐ মিলিটারী সাহেবদের উপরওয়ালা অফিসার সাহেবকে ডাকিয়ে বললেন: "মকদ্দমা withdraw করাও। একটা নিরস্ত্র বাঙালী ছোকরা আট জন মিলিটারী সাহেবকে মেরে flat করে দিয়েছে, তারই আবার মকদ্দমা করছ! লজ্জা করে না?" হুইলার সাহেবের ধমকানি খেয়ে মিলিটারী সাহেবরা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।

এমনি সব কাহিনী যতীন্দ্রনাথের জীবনে অসংখ্য ঘটেছে।

আশ্চর্য, এই অমানুষিক শক্তি ও সাহসের অধিকারী ব্যক্তিটি জীবনে কখনও নিজ শক্তির অপব্যবহার করেন নি! কখনও কারও উপরে তিনি অত্যাচার করেন নি, পীড়ন করেন নি, কখনও কাকেও কাপুরুষোচিতভাবে আক্রমণ কিংবা প্রহার করেন নি। সর্বদাই তাঁর শক্তিকে প্রয়োগ করেছেন আর্তের রক্ষায় আর অত্যাচারীর ঔদ্ধত্যের দমনে।

কয়ার জীবন

যৌবনের প্রারম্ভেই যতীন্দ্রনাথের মধ্যে আর্ত ও পীড়িতের সেবা করবার একটা সহজাত প্রবণতা দেখা দেয়। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রোগীর সেবা করতে আরম্ভ করেন। কোন রোগীর সেবা করবার লোক নেই শুনলেই তিনি অযাচিত হয়ে ছুটে যেতেন তার শয্যাপার্শ্বে। রাতের পর রাত জেগে তিনি রোগীর সেবা করতেন অক্লান্তভাবে। শত-শত ব্যাধিগ্রস্ত রুগ্ন অসহায় ব্যক্তিকে তিনি স্নেহ-করস্পর্শ ও দরদভরা প্রাণের সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন। বসন্ত, কলেরা ও যক্ষ্মাপীড়িত রোগীকে তিনি নিঃসঙ্কোচে মাতৃস্নেহের মত নিবিড় স্নেহ দিয়ে সেবা করতেন। দুহাতে কুষ্ঠরোগীর সেবা করতেও তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

যতির প্রাণের মধ্যে যেন আনন্দের অগাধ পারাবার ছিল। বিজয়া দশমীর দিনে কয়া গ্রামের দুর্গাপ্রতিমাগুলির গড়াই নদীতে নিরঞ্জন হত। ঐ দিনটি ছিল গ্রামের একটা মহা আনন্দের দিন। নৌকায় প্রতিমা তুলে নৌকাগুলি বাদ্যভাণ্ডসহ ঘাটে-ঘাটে ঘোরান হত, নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হত, নদীর উভয় তীরে সহস্র-সহস্র লোক—আবালবৃদ্ধবনিতা—প্রতিমা দর্শন করবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। প্রতিমার নৌকাগুলি বালক-বালিকায় পূর্ণ থাকত, তাছাড়া আরও বহু বাচের নৌকা বেরুত। এই বাচের নৌকাগুলিতে গ্রামের বালক-বালিকারা উঠে নদীতে বাচ দিত, ঠাকুরের নৌকার পিছনে-পিছনে ঘুরে বেড়াত। সমস্ত নদী বাচের নৌকার তাড়নে তোলপাড় হয়ে উঠত। যতি একটা প্রকাণ্ড বাচের নৌকাতে অসংখ্য ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উঠতেন ও নিজে হাল ধরে

নৌকা চালাতেন, বড় ছেলেরা দাঁড় টানত, তিনি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সমস্ত নদী তোলপাড় করে নৌকা বাইতেন। ছেলে-মেয়েরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে কলরব করত, গান গাইত, নৃত্য করত, কাঁসর-ঘণ্টা-ঢাক বাজাত—তিনিও তাদের সঙ্গে কলরব করতেন, গান গাইতেন, নৃত্য করতেন, বাজনা বাজাতেন। গ্রামের সব ছেলে-মেয়েরই সাধ বড়দার নৌকায় উঠবে; কিন্তু তা'ত সম্ভবপর নয়, তাই তিনি পালা করে এক-এক দলকে নৌকায় নিতেন, আবার খানিক বাদে তাদের নামিয়ে দিয়ে নূতন দলকে তুলে নিতেন।

দুর্গাপূজার পরে রক্ষাকালী পূজা হত। গ্রামে স্বতন্ত্র কালীবাড়ি ছিল। মস্ত বড় প্রতিমা তৈরি হত, সারারাত্রিব্যাপী পূজা হত। খুব ধুমধামের ব্যাপার! মধ্যরাত্রে পূজা যখন খুব জমে উঠত, পুরোহিত দু হাতে দুটি বড়-বড় জ্বলন্ত মাটির ধুনুচি নাচিয়ে-নাচিয়ে ও নিজেও নেচে নেচে আরতি করতেন। সমস্ত নরনারী গলবস্ত্রে যুক্ত করে আরতি দেখতেন আর 'মা-মা' বলে ডাকতেন। অসংখ্য বালক-বালিকা একধারে নিস্তব্ধ হয়ে আরতি দেখত আর ঢাকের বাদ্যকর মুচিরা বড়-বড় ঢাক কাঁধে নিয়ে নেচে-নেচে, ঘুরে-ফিরে প্রবলভাবে ঢাক বাজাত। সমস্ত পরিবেশটি যখন ভক্তি, আনন্দ উত্তেজনায় গমগম করত, যতি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসে কোন এক মুচির কাঁধ থেকে তার ঢাকটি কেড়ে নিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিতেন আর লাফিয়ে-লাফিয়ে নেচে-নেচে ঢাক বাজাতেন। যতির যেন তখন বাহ্যজ্ঞান থাকত না। তিনি কখনও লাফিয়ে, কখনও হাঁটু গেড়ে বসে, কখনও প্রবলভাবে ঘুরপাক খেয়ে প্রতিমার সম্মুখে ঢাক বাজাতেন। তাঁর এই ভাবোন্মাদ অবস্থা দেখে আর-এক জনও ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে উঠতেন। তিনি শ্রীপঞ্চানন মজুমদার। তিনিও ছুটে গিয়ে একটা ঢাক কেড়ে

নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করতেন। তখন আরম্ভ হত দু'জনের ঢাকের বাজনার পাল্লা। কি মিষ্টি ঢাকের বাজনার হাত ছিল এঁদের দু'জনেরই! তখন মুচিরা দু' দলে বিভক্ত হয়ে জনকতক দাঁড়াত যতির পেছনে আর জনকতক দাঁড়াত পঞ্চু মজুমদারের পেছনে—দুই দলে চলত বাজনার প্রতিযোগিতা। পঞ্চু মজুমদার ঢাকের বাদ্যে বোল তুলতেন ঃ "আনরে ভোলা, জপের মালা, ভাসি গঙ্গার জলে"। যতি বোল তুলতেন ঃ "আমার মা কৈলাসেতে পাননি খেতে, আমরা তাঁরে খাওয়াব"। তখন সেই গগনবিদারী ঢাকের বাদ্যে সেই ভক্তমণ্ডলীর 'মা-মা' ডাকে, বালক-বালিকাদের চিৎকারে ও পুরোহিতের আরতিতে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হত।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রে যতি গ্রামের ছেলেদের নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে বেরুতেন। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে তাঁরা বেরুতেন আর সারারাত্রি ধরে নিমন্ত্রণ খেতেন। গ্রামের যত বাড়িতে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা হত, প্রত্যেক বাড়িতে গিয়েই তাঁরা খেতেন। যে-সব বাড়িতে লুচি ভোগ দিত, সেই সব বাড়িতে তাঁরা একখানি লুচি আর-একখানা ভাজা বা একটা নাড়ু খেতেন, কোন-কোন বাড়িতে একটুখানি চিঁড়ে-দই, কোন বাড়িতে একটুখানি ক্ষীর আর খাগ্ড়াই, কোন বাড়িতে একটা সন্দেশ—এমনি ছিল সেই নিমন্ত্রণ খাওয়া। এমনিভাবে সারারাত্রি ধরে প্রত্যেক বাড়িতে তিনি নিমন্ত্রণ খেতেন, সঙ্গে থাকত গ্রামের সব বাড়িরই ছেলেরা। সকল পাড়ায় সকল বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে-খেতে রাত্রি শেষ হয়ে যেত, সব শেষে উষাকালে শশী ডাক্তারের বাড়িতে এসে গরম খেচুড়ি আর ইলিশ-মাছ ভাজা খেয়ে দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার বাড়ি চলে যেত। কি আনন্দ যে উথলে উঠত প্রতি গৃহস্থ-বাড়িতে এই রাত্রে, সে আর বলবার কথা নয়। যতির মৃত্যুর পরেও গ্রামে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার

রাত্রে এইভাবে সারারাত্রিব্যাপী প্রতি বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। বড়দার প্রবর্তিত অনুষ্ঠান গ্রামের ছেলেরা ত্যাগ করে নি।

গ্রামের হরিসভা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামের থিয়েটার পার্টি ও ফুটবল ক্লাব তিনিই গড়েছিলেন। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বার মাস আপামর সাধারণের মনে আনন্দের প্লাবন বইত।

চৈত্র মাসে কয়া গ্রামে ধুমধামের সঙ্গে চড়ক পূজা হত। নদীর ধারে কড়ার ঘাটে মেলা বসত। গ্রামের সব নর-নারী, সব ছেলে-মেয়ে এখানে জমা হয়ে উৎসব করত। যতি মেলায় এসে শিশুর মত আনন্দ করতেন। তিনি রাশি-রাশি কদমা আর খাগ্‌ড়াই কিনতেন, সমস্ত ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতেন, নিজে তাদের সঙ্গে খেতেন। এক পয়সা দামের ভেঁপু বাঁশী কিনে বালক-বালিকাদের তিনি দিতেন, নিজে সেই ভেঁপু বাঁশী মুখে দিয়ে মেলাময় বাজিয়ে-বাজিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

অনেক বছর পরে!

বুদো পাল নামে গ্রামে একটি লোক ছিল, মুদীখানার দোকান করত। সমস্ত বছর সে ভাল থাকত; কিন্তু চৈত্র মাসে প্রথম গরম পড়লেই সে কিছুদিনের জন্য পাগল হয়ে যেত। তখন তাকে শান্ত রাখা যেত না, তার বাড়ির লোকেরা তখন তার হাতে-পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিত। সে উলঙ্গ হয়ে বেড়ী পরে গ্রামময় ঘুরে বেড়াত। সারা রাত্রি সে গ্রামের ভাল-ভাল মৃত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে-কেঁদে বেড়াত। আমি বাল্যকালে কত বার রাত্রে চিৎকার-শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে এই পাগলের ক্রন্দন শুনেছি। আমার প্রমাতামহের নাম করে পাগল হাতের আর পায়ের বেড়ী বাজিয়ে-বাজিয়ে চিৎকার করে কেঁদে-কেঁদে গাইত—

শশী মজুমদার মরে গেল—শশী মজুমদার মরে গেল।
শশী মজুমদার চরের উপর—শশী মজুমদার চরের উপর॥

যতীন্দ্রনাথের বড়মামা বসন্তকুমারের নাম করে সে কেঁদে-কেঁদে গান করত—

বসন্ত চাড়ুজ্যে মরে গেল, বসন্ত চাড়ুজ্যে মরে গেল।
বসন্ত চাড়ুজ্যে মরে গেল, কয়া গ্রাম শূন্য হল॥

এর পরে সে যেন উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ত আর তার যথাসাধ্য জোরে চিৎকার করে শোককম্পিত কণ্ঠে কেঁদে গেয়ে উঠত—

যতি মুখুজ্যে কোথায় গেল, যতি মুখুজ্যে কোথায় গেল!
কোথায় গেল, কোথায় গেল আর এল না, কোথায় গেল?
যতি মুখুজ্যে হারিয়ে গেল, কয়া গ্রাম আঁধার হল,
ওরে কোথায় গেল, কোথায় গেল, আর এল না কোথায় গেল?

সেই নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে সেই পাগলের বুকভাঙ্গা ক্রন্দনের হাহাকারের ধ্বনি যেন কয়া গ্রামের সমস্ত মানুষের বুকের মধ্যেই প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলত—

কোথায় গেল, কোথায় গেল, আর এল না কোথায় গেল?

বিপ্লব দীক্ষা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলা দেশে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে ওঠে ও বৈপ্লবিক কার্য-কলাপ আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রথম ইংরাজ বিতাড়নের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর থেকে ক্রমাগত ভারতের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহ ত আসলে শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়, ওটি ছিল ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন। ঐ বিদ্রোহের নেতারা ছিলেন সকলেই ভারতের স্বাধীনতাকামী। নানা সাহেব, তান্তিয়া টোপী, কুমারসিংহ, রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি যাঁরা ঐ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁরা কেউই সিপাহী ছিলেন না—তাঁরা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার পূজারী ও পূজারিণী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যই তাঁরা ঐ বিদ্রোহ সংগঠন করেছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সেই স্বপ্নকে সফল করবার জন্য বিদ্রোহের মন্ত্র তাঁরা সেদিন প্রচার করেছিলেন ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে। সিপাহীদের কাছেই ছিল অস্ত্র আর যুদ্ধের কৌশলেও তারা ছিল শিক্ষিত ; অতএব সেদিনকার সেই প্রথম স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সিপাহীদের উদ্বুদ্ধ করে তাদেরই সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লব-সংগঠনের মতলব করেছিলেন।

যথাসময়ে ভারতের বিভিন্ন গোরাব্যারাকে সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেল। ভারতের দিকে-দিকে শবসাধক বীরাচারী তান্ত্রিকের দল মাতৃমন্ত্র পাঠ আরম্ভ করে দিলেন। সেদিন শান্ত ভারতের বুকে আচম্বিতে চারিদিকে বেজে উঠল প্রলয়ের ডমরু-বিষাণ, দিগন্তে

ঈশানে ঘোর গর্জনে ফুঁপিয়ে উঠল কালবৈশাখীর হা-হা শ্বাস। ভারতের বিদ্রোহী মন সেদিন সহসা রণরঙ্গে মেতে উঠল মাতঙ্গিনী এলোকেশী-রূপে। অসংবৃতা করালী—রুধিরপিপাসায় লেলিহানজিহ্বা বিদ্রোহের দেবী—রুদ্রাণী মূর্তিতে আরম্ভ করলেন প্রলয়-নাচন। ললাটে ধকধক জ্বলে উঠল তীব্র বহ্নিশিখা, কণ্ঠে খলখল রবে হেসে উঠল মুণ্ডমালা, ঝকঝক দীপ্তিতে বরাভয় করে চমকাতে লাগল খড়্গের জ্যোতি।

শক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সেদিন জেগে উঠল ভক্তিও—রুদ্রাণীর সঙ্গে-সঙ্গে রুদ্র। নিদ্রোত্থিত রুদ্রের পিঙ্গল জটাকুণ্ডলীর ভিতরে ফুঁসে উঠল ক্রুদ্ধ নাগ-নাগিনীর দল, বাঁধনহারা জটামালা উঠল দুলে মহাব্যোমে। স্ফুরিত অধরের ফুৎকারে মুহুর্মুহুঃ বাজতে লাগল প্রলয়বিষাণ, সংহার-ছন্দে দুলে উঠল ভীম ত্রিশূল। ভারতের দিকে-দিকে আরম্ভ হয়ে গেল স্বাধীনতা-উৎসবের রক্ত-হোলী। ছিন্নমস্তা সাধকদল নিজের খড়্গে নিজের মুণ্ড ছেদন করে উষ্ণ রক্তধারা ঢেলে-ঢেলে রচনা করতে লাগল রক্ত-তড়াগ, আর স্বপ্ন দেখতে লাগল সেই তড়াগে যুগান্তের তমিস্রা বিদারণ করে ফুটে উঠবে স্বাধীনতার রক্তকমল।

কিন্তু সে রক্তকমল সেদিন ফুটল না। ভারত ইতিহাসের বেদনামাখা করুণ বিপর্যয়—পানিপথ আর পলাশীর বিপর্যয়েরই তুল্য।

সিপাহী বিপ্লব—ভারতের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। প্রথম বিপ্লবী শহীদ ব্রাহ্মণযুবক মঙ্গলপাণ্ডে বারাকপুরের অশ্বত্থবৃক্ষে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে পরে আত্মোৎসর্গ করলেন। ধর্মক্ষেত্রে বুদ্ধ-গয়ার বোধিদ্রুমের মতই বারাকপুরের সেই বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক পরম তীর্থ। বারাকপুরের গান্ধীঘাটের

মতই বারাকপুরের এই চিরস্মরণীয় অশ্বত্থবৃক্ষটি জাতির নমস্য। কিন্তু আজও জাতি তাকে প্রণাম করে নি, তার তলায় শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়ে অবিস্মরণীয় স্মৃতিবেদী নির্মাণ করে নি ; কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, একদিন—আর-কেউ না করে, অন্ততঃ বাঙালী তাকে আবিষ্কার করবে, সেখানে বেদী নির্মাণ করবে, দীপ এবং নির্মাল্য দিয়ে তাকে পূজা করবে। এই অবিস্মরণীয় পূত মহাবৃক্ষকে বাঙালী কিছুতেই চিরকাল ভুলে থাকবে না।

বিদ্রোহী-নেতা তান্তিয়া টোপীও ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দান করলেন। আরও কত শত শত বিদ্রোহী বীর ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। ঘুমন্ত ভারতে এঁরাই সেদিন আপন-আপন প্রাণ বিসর্জন করে ভারতবর্ষকে দিয়ে গেলেন প্রাণদানের দীক্ষা। নানা সাহেবকে ইংরেজ গ্রেফতার করতে পারে নি। বিপ্লব ব্যর্থ হতেই তিনি চলে গেলেন অজ্ঞাতবাসে। বহু বৎসর পরে অজ্ঞাতবাসেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইংরেজ সহস্র চেষ্টাতেও তাঁকে কিছুতেই বন্দী করতে পারেনি। নানা সাহেব দিয়ে গেলেন পরবর্তী বিপ্লবীদিগকে অজ্ঞাতবাসের দীক্ষা।

সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ভারতের দিকে-দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠল ঘুম-ভাঙান গান। নিদ্রিত ভারতের কানে-কানে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল স্বাধীনতার নান্দীপাঠ।

এর পর থেকেই ভারতে নানাভাবে আরম্ভ হয়ে গেল মুক্তিসাধনা। সাহিত্যে এবং দেশের ভাববাদে স্বাধীনতার আদর্শ ঝঙ্কৃত হতে লাগল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন 'আনন্দমঠ' স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত আদর্শবাদের মধ্যেও দেশের তরুণ প্রাণ পেল স্বাধীনতার উদ্দীপনা। ভারতে সংগঠিত হল জাতীয় কংগ্রেস। এরই কিছুকাল পরে মহারাষ্ট্র ও বাংলা দেশে সংগঠিত হল বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি। বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবব

প্রতিষ্ঠায় প্রথম হোতা শ্রীঅরবিন্দ, পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি। এঁদেরই উদ্যোগ ও চেষ্টায় বাংলা দেশে ১৯০২ সালে কলকাতায় প্রথম গুপ্ত সমিতি 'অনুশীলন সমিতির' প্রতিষ্ঠা হয়। অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে যে কয় জন স্বাধীনতার তরুণ পূজারী সব প্রথমেই এই সমিতির সংস্পর্শে এসেছিলেন, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। যতি তখন যুবক। তাঁর আদর্শবাদী, সংবেদনশীল, সুদূরপ্রসারী, বলিষ্ঠ মন সহজেই বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল !

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের দ্বারা ইংরাজ বিতাড়নের প্রথম স্বপ্ন দেখেন বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামনিবাসী বীর যুবক শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সুদূর বরোদায় গিয়ে সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন ও কয়েক বৎসর মিলিটারী ট্রেণিং গ্রহণ করে নিজেকে বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার উপযোগী করে তোলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে বরোদায় চাকরি করতেন। অদ্বৈতাচার্য যেমন গঙ্গাতীরে দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করে ও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আকূতির সহিত অবিরাম কাতর আহ্বানের দ্বারা ভগবানকে জীবতারণের জন্য নদীয়ার গোরাচাঁদ-রূপে অবতরণ করিয়েছিলেন, এই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেইরূপ শ্রীঅরবিন্দকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃরূপে ভারতের কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়েছিলেন। বস্তুতঃ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের 'ভগীরথ' বলা যেতে পারে। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় যতীন্দ্রনাথকে বিপ্লবযুগের 'ব্রহ্মা' নামে আখ্যাত করেছেন।

১৯০২ সালে কলকাতায় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি 'অনুশীলন

সমিতি' গড়ে উঠল। শ্রীঅরবিন্দ তখনও বরোদা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন নি; বরোদায় অবস্থান করেই তিনি কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন এবং নিজেকে সর্বতোভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিমজ্জিত করলেন। এক দিকে লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও অন্য দিকে শ্রীঅরবিন্দের বাংলায় আগমন—এই দুইটি ঘটনা বাংলা দেশে প্রবল স্বদেশী আন্দোলনের জন্মদান করল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺বিপিনচন্দ্র পাল, ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলা দেশে বয়কট আন্দোলন বা বিলাতী বর্জন আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং দেখতে-দেখতে সহস্র-সহস্র দেশপ্রেমিক নর-নারী তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সুরেন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র বজ্র নির্ঘোষে ঘুমন্ত বাঙালী জাতিকে জাগিয়ে তুললেন। তাঁদের কণ্ঠের জলদগম্ভীর মন্দ্র এবং অগ্নিময় ভাষণ সেদিন বাঙালীর প্রাণে-প্রাণে বিদ্যুৎ-শিহরণ জাগিয়ে তুলল!

কি অপূর্ব সমাবেশই সেদিন হয়েছিল বাংলা দেশে! এক দিকে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের অগ্নিময়ী বক্তৃতা—সে ত বক্তৃতা নয়, কাড়া-নাকাড়া আর দামামার ঐক্যতান, মানুষকে একেবারে যুদ্ধের উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত করে তোলে। বাগ্মিতার এত বড় পরাকাষ্ঠা ভারতবর্ষে আর দেখা গেল না! আর-এক দিকে রবীন্দ্রনাথ, রজনী সেন ও কাব্যবিশারদের স্বদেশী গান। প্রাণমাতানো স্বদেশী গানের সুরে-সুরে আর ঝঙ্কারে-ঝঙ্কারে তাঁরা দিলেন দেশের নিমীলিত

মানস-শতদলকে উন্মীলিত করে। ওদিকে কাব্যবিশারদ ও সখারাম গণেশ দেউস্কর 'হিতবাদীতে' ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যায়' তাঁদের লেখনীযোগে উৎসারিত অনলস্রাব বর্ষণ করে-করে পাঠকের মনে উদ্দীপনা জাগাতে লাগলেন। এর পরে আবার শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রতিদিন স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। সাপুড়িয়ার মধুর বংশীধ্বনিতে যেমন কুণ্ডলীপাকানো নিদ্রিত অজগর আনন্দে ফণা তুলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় আর বাঁশরীর সুরে সুরে দুলে-দুলে নৃত্য করে, সেদিন শ্রীঅরবিন্দের সম্মোহনী লেখনী-নিঃসৃত অপূর্ব রচনা-ঝঙ্কারে জাতির মোহাবিষ্ট অলস কুণ্ডলীকৃত তন্দ্রাচ্ছন্ন চিত্ত ভুজঙ্গম তেমনি জেগে উঠে, কুণ্ডলী ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবেগে আর চাঞ্চল্যে দুলে-দুলে নাচতে লাগল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা দেশে জেগে উঠল এক অভাবনীয় উন্মাদনা। চারিদিকে জনসভা, মিছিল ও বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব চলতে লাগল। ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্ট আরম্ভ করলেন দমন ও পীড়ন। ভয় দেখিয়ে, নির্যাতন করে, অত্যাচার চালিয়ে, তাঁরা আন্দোলনকে দমন করবেন—ধ্বংস করবেন, মনস্থ করলেন। তখন বাংলা দেশে আরম্ভ হল সরকারী দমননীতির সঙ্গে বাংলার নির্ভীকতা ও আদর্শবাদের সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা। গভর্ণমেণ্ট যেই উগ্র দমননীতি কার্যকরী করে দিলেন, সুরেন্দ্রনাথ অমনি তার প্রতিবাদ করে বজ্রনির্ঘোষে জবাব দিলেন "We shall not surrender." তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বাংলার লক্ষ-লক্ষ নর-নারী হুঙ্কার দিয়ে উঠল "We shall not surrender." সেদিন বাঙালী জাতি আনন্দে, উৎসাহে তাদের নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নামকরণ করল "Surrender not Banerjee" বলে। সুরেন্দ্রনাথ

মহতী জনসভায় দাঁড়িয়ে জাতিকে আহ্বান করলেন পীড়ন আর নির্যাতনকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য। অত্যাচার-বরণের দ্বারা আপন মেরুদণ্ডকে মজবুত করবার জন্য অপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, বাম কর আপন বক্ষে স্থাপন করে ও দক্ষিণ কর উর্ধ্বে প্রসারিত করে জলদমন্দ্রে তিনি উচ্চারণ করলেন : "Persecution is the backbone of a nation." সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন শত-শত 'স্বদেশী' নেতা ও কর্মী বাঙলা দেশের নগরে-নগরে ও পল্লীতে-পল্লীতে বক্তৃতা করে স্বদেশী মন্ত্র ও বিলাতী বর্জন প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

কান্তকবি রজনী সেন গান রচনা করলেন "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে-রে ভাই—দীন দুঃখিনী মা যে তোদের, এর বেশী আর সাধ্য নাই।" কি অভূতপূর্ব ভাবই যে সেদিন এই গানখানি সারা বাংলাদেশে সঞ্চারিত করেছিল! বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে সেদিন আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী এই গান গেয়েছে, অশ্রু বিসর্জন করেছে, আর বিলাতী বস্ত্র ও দ্রব্য বর্জনের শপথ গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তখনও বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথ হন নি। তিনি তখনও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির তরুণ কবি রবি ঠাকুর। সেই তরুণ রবি সেদিন দিনের পর দিন তাঁর অপূর্ব অনবদ্য স্বদেশী গানের ভিতর দিয়ে যে দীপ্তি ও কিরণধারার অজস্র বর্ষণে দেশকে জাগিয়েছিলেন, তা সমস্ত সাহিত্য-জগতে যেন অতুলনীয়। একদিন মিলটন যেমন তাঁর লেখনী-সুধা সিঞ্চন করে ইংরেজ জাতিকে জাগিয়েছিলেন, তেমনি সেদিন এই ঠাকুরবাড়ির কবি তাঁর প্রাণমাতানো অসংখ্য গানের সুরে-সুরে বাংলাদেশকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। গভর্ণমেণ্টের দমন ও পীড়নকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করলেন :

“ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে ;
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন টুটবে,
ততই মোদের বাঁধন টুটবে।”

তিনি আরও গাইলেন :

“বিধির বিধান কাটবে তুমি এতই শক্তিমান
তুমি কি এতই শক্তিমান ?
শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরো
তোমরা হও-না কেন যতই বড়, আছেন ভগবান,
আমাদের আছেন ভগবান।”

কাব্যবিশারদের গান বাহির হ'ল :

ওরা বেত মেরে কি মা ভোলাবে, আমরা কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি, কে পালাবে মা ফেলে ?”

এই সকল বক্তৃতা, সঙ্গীত ও সংবাদপত্র-রচনার মধ্য দিয়ে বাঙলাদেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা প্রবাহিত হ'তে লাগল। বাঙলায় বিলাতী-বর্জন কর্মপদ্ধতির উপরে এক প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে উঠল এবং সেই আন্দোলনের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের ক্রমাগতই সংঘর্ষ চলতে লাগল।

একদিকে যেমন এই প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলন বাঙলার সর্বত্র

ব্যাপ্ত হ'তে লাগল, অন্যদিকে তলে-তলে সঙ্গোপনে আরম্ভ হয়ে গেল বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির প্রসার। ১৯০২ সালে প্রথম অনুশীলন সমিতি নামে যে গুপ্তসমিতি স্থাপিত হল, তার সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র। পি. মিত্রের বাড়ি নৈহাটীতে এবং তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তিনি পেয়েছিলেন রাজনৈতিক প্রেরণা ও দীক্ষা। তাই তিনি বঙ্কিমের অনুশীলন-বাদের জীবন-দর্শনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গুপ্তসমিতির নাম দিলেন "অনুশীলন সমিতি"।

গুপ্তসমিতি স্থাপিত হওয়ার কিছুকাল পরে অরবিন্দ-সহোদর বারীন্দ্রকুমার এসে গুপ্তসমিতিতে যোগদান করলেন। অল্পকালের মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক দেশপ্রাণ স্বাধীনতাকামী বীর যুবক গুপ্তসমিতিতে প্রবেশ করলেন। দল থেকে প্রচারের জন্যে মুখপত্ররূপে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হ'ল "যুগান্তর" নামে। এর পরে মতভেদের দরুণ বিপ্লববাদ ও গুপ্ত সমিতি আন্দোলনের প্রবর্তক ও হোতা, (ডাঃ যাদুগোপালের ভাষায়) বিপ্লবান্দোলনের ব্রহ্মা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই দল সংস্রব ছিন্ন করেন ও পি. মিত্রের সহিতও সংস্রব শিথিল হয়ে যায়।

এই সকল কারণ এবং দলের মুখপত্রের নাম "যুগান্তর" হওয়ার জন্য ক্রমশঃ দলটি "যুগান্তর দল" নামেই পরিচিত হয়ে উঠল। ওদিকে অনুশীলন সমিতিও ক্রমেই বড় হতে লাগল এবং স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করতে লাগল।

বাঙলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমস্ত নরনারীর মনে এক নতুন জাগরণ এনে দিল। বিলাতী পণ্য বয়কটের প্রতিজ্ঞা মানুষ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে লাগল। সর্বত্র

বিলাতী বয়কটের জন্যে জন-সভা হতে লাগল। সেকালে বিলাতী কাচের চুড়ী আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা কাচের চুড়ী ব্যবহার করতেন। কোটী-কোটী টাকার বিলাতী কাচের চুড়ী আমাদের দেশে বিক্রীত হত। বিলাতী কাপড় বয়কটের সঙ্গে-সঙ্গেই এই কাচের চুড়ী বয়কটের আন্দোলনও আরম্ভ হয়ে গেল। গান বেরুল—'শুন গো বঙ্গনারী, কাচের চুড়ী আর পরো না।' মেয়েরা হাতের পুরনো কাচের চুড়ী ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন, আর নূতন করে কেনা বন্ধ করে দিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন দেশে খুব জোর চলতে লাগল। দেশের শিক্ষিত গণ্য-মান্য ব্যক্তি মাত্রেই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের জমিদাররা সেদিন এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং এই আন্দোলনকে সাহায্য করেছিলেন। ব্যারিস্টার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ী—সকল সম্প্রদায়ই এই আন্দোলনে যোগদান করেন ও আন্দোলনকে আর্থিক সাহায্য করেন; তার ফলে আন্দোলন খুব প্রবল ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন নিখিল ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। বাঙলায় যে অগ্নিশিখা প্রথম জ্বলল, ক্রমে তা সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। বাঙলার সুরেন্দ্রনাথ তখন নিখিল ভারতের নেতৃ-শিরোমণি। সুরেন্দ্রনাথ ভারতের সমস্ত প্রদেশকে জাগ্রত করলেন, কংগ্রেসের মধ্যে নিয়ে এলেন এবং ভারতীয়-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। তার আগে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ভারতীয়-চেতনা বলে কোন বস্তু ছিল না। প্রত্যেক প্রদেশ নিজ-নিজ প্রদেশের কথা চিন্তা করত, নিজের প্রদেশকেই স্বদেশ বলে মনে করত, সমস্ত ভারতের কথা কেউ ভাবত না, নিখিল

ভারতকে নিজের স্বদেশ বলে ধারণা করতে পারত না। সুরেন্দ্রনাথই তাঁর অলৌকিক প্রতিভা, দেশপ্রেম ও বাগ্মিতার দ্বারা প্রথম ভারতবর্ষে এই ভাবধারার সৃষ্টি করলেন, সমস্ত প্রদেশকে জাগ্রত করে, একত্র করে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করে নিখিল ভারতবাসীর মনে এক অখণ্ড ভারতীয়-চেতনা সৃষ্টি করলেন। এই জন্যই সুরেন্দ্রনাথের নাম হয়েছিল সেদিন "Father of Indian Nationalism" এবং রাষ্ট্রগুরু। সুরেন্দ্রনাথ তখন কংগ্রেসে একচ্ছত্র নেতা। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। এই ২০।২২ বৎসর কাল তিনিই কংগ্রেসকে লালন করেছেন এবং পরিচালনা করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব তখনও অপ্রতিহত প্রভাবে চলছে, এমন সময়ে এল তাঁর নেতৃত্বের বিরোধী এক শক্তি এবং ভাববাদ। এই নূতন ভাববাদ সুরেন্দ্রনাথের ভাববাদ অপেক্ষা অধিক উগ্র, উত্তপ্ত ও অগ্রগামী। এই নূতন ভাববাদ উৎসারিত হতে লাগল তিনজন নেতার মধ্য দিয়ে। এই ত্রি-নেতৃত্বের নাম 'লাল—বাল—পাল'-এর ত্রিতয় (Trinity) অর্থাৎ পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বাঙলার বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্ব। এঁরা সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী দলকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁদের আখ্যা দিলেন "মডারেট"—মধ্যপন্থী বা নরম দল বলে ও নিজেদের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করলেন "এক্সট্রিমিস্ট" বা চরমপন্থী দল বলে। এই 'লাল—বাল—পাল'-পরিচালিত চরমপন্থী বা গরম দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ।

ভারতবর্ষে ও বাঙলাদেশে তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে এই নরম গরম উভয় দলের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে পুষ্টিলাভ করতে লাগল ভারতের গুপ্তসমিতির

বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা। চরমপন্থী দলেরই পরিপূর্ণ সাহায্য এবং উৎসাহ লাভ ক'রে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং বাঙলাদেশে গুপ্তসমিতির আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল।

যতীন্দ্রনাথ 'বাঘা' কেন ?

একদিন যতীন্দ্রনাথ অনেক রাত্রে কলকাতা থেকে কয়াতে এলেন। রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুতে অনেক দেরি হয়ে গেল, পরদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙল না।

সকালবেলাতে কলুপাড়া থেকে কয়েকজন লোক এল যতীন্দ্রনাথের মামার বাড়িতে। তারা এসে আবেদন জানাল বন্দুক নিয়ে গিয়ে একটা বাঘ মেরে দিতে হবে। কয়েকদিন ধরে এই বাঘটা কাছাকাছি কয়েকখানা গ্রামে বড় উৎপাত লাগিয়েছে, প্রতি রাত্রেই কৃষক গৃহস্থ বাড়িতে হানা দিচ্ছে আর গোয়াল থেকে দু-একটা করে গরু মেরে নিয়ে পালাচ্ছে। আজ ভোরবেলাতে সেই বাঘটাকে দেখা গেছে কলুপাড়ার নিকটে একটা বেতের বনের মধ্যে ঘুমুচ্ছে। তাই কলুপাড়ার লোকেদের আবেদন যে, এখুনি গিয়ে বাঘটাকে মেরে দিতে হবে।

যতীন্দ্রনাথ তখনো ঘুমুচ্ছেন দেখে তাঁর মামাত ভাইয়েরা তাঁকে ঘুম না ভাঙিয়ে নিজেরাই বন্দুক নিয়ে চললেন বাঘ শিকার করতে। বেত বনের কাছে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন সঙ্গে বিস্তর লোক জড় হয়ে গেছে। কেউ নিয়েছে লাঠি, কেউ বংশখণ্ড, কেউ কুড়ুল কেউ সড়কী, কেউ বা একখানা বড় কাটারী। প্রায় দু'শ লোকের এক বাহিনী অগ্রসর হতে লাগলেন বেতবনের দিকে। তাঁদের পুরোভাগে চলেছেন ফণীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথের বড় মামাত ভাই। বাহিনীর মধ্যে ইতর-ভদ্র সব রকমের সব বয়সের লোকই আছেন। ধীরে ধীরে সাবধানে বাহিনী ক্রমশঃ সেই বেতবনের নিকটস্থ হলো। দেখা গেল যে ব্যাঘ্রবর শুয়ে আছেন বটে, তবে এখন আর নিদ্রিত

নন, ঘুম তাঁর ভেঙেছে, সদ্য নিদ্রাভঙ্গের পরে তিনি অর্ধনিমীলিত নেত্রে হাই তুলছেন আর পরম আরামে প্রভাত-অরুণ-কিরণ সেবন করছেন।

লোকজনের কলরব কোলাহলে বাঘটা সহসা ভয় পেয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। শায়িত বাঘকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সেই সশস্ত্র জনতা উল্লাসে ভয়ে ও কৌতুকে বিকট চীৎকার করে উঠল, আর সেই গগনভেদী মনুষ্যকোলাহলে সন্ত্রস্ত হয়ে বাঘ বেতবন থেকে এক লম্ফে রাস্তায় এসে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। শিকার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় দেখে ফণীন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই ছুটন্ত বাঘকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। কিন্তু গুলি বাঘের বুকে না লেগে তার পাছায় লাগল, পাছার একটুখানি চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল, বাঘটা কিছুমাত্র জখম হোল না। ভয়ে এবং ক্রোধে বেপরোয়া হয়ে বাঘ রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল।

ইতিমধ্যে হয়েছে কি, যতীন্দ্রনাথ ঘুম থেকে উঠে শুনলেন যে তাঁর মাতুল-পুত্রগণ বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে কলুপাড়ার দিকে রওনা হয়েছেন। তিনি একটা বড় গোছের কলমকাটা ছুরি নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং ছুরি দিয়ে একটা দাঁতন কেটে নিয়ে দাঁতন করতে করতে কলুপাড়ার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি, গায়ে ছিল একটা শার্ট।

যতীন্দ্রনাথ ছুরিখানা শার্টের পকেটে মুড়ে রেখে দিয়ে দাঁতন করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, যেতে যেতে তিনি দূর থেকে বহু মানুষের উন্মত্ত চীৎকার আর টিনের কেনেস্তারা পেটান'র শব্দ শুনতে পেলেন ; তখন বুঝলেন যে জনতা বাঘ দেখতে পেয়েছে। তিনি তখন যেদিকে শব্দ হচ্ছে সেদিকে চললেন। একটুখানি অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলেন যে, এক বিশাল জনতা ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে, তাদের দলের পুরোভাগে তাঁর মামাত ভাই ফণীন্দ্র

বন্দুক নিয়ে ছুটে আসছে। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, পরমুহূর্তেই দেখতে পেলেন যে, নয়নজলি লাফিয়ে টপ্‌কে পার হয়ে সমুখে বাঁদিকের রাস্তা থেকে এক প্রকাণ্ড বাঘ তাঁর নিকটে ধেয়ে আসছে কিছু চিন্তা করার পূর্বেই বাঘ তীব্র গতিতে তাঁর দিকে ছুটে এসে তাঁর কাঁধের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যতীন্দ্রনাথ এই অতর্কিত বাঘের আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকা মেরে বাঘটাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিলেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বাঘ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তার দুই থাবা তাঁর দুই কাঁধের উপরে ন্যস্ত করে তাঁর গলা কামড়াবার জন্য তার দ্রংষ্ট্রা বার করল যতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁর দুই হাত দিয়ে বাঘের গলা টিপে ধরে তার ব্যাদিত করাল বদন ও বিশাল দ্রংষ্ট্রাকে প্রতিহত করতে লাগলেন তখন তাঁ'তে আর সেই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রে আরম্ভ হোল মল্লযুদ্ধ। কখনো তিনি বাঘকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপরে উঠে বসেন এবং সজোরে দুই হাতে তার গলা টিপতে থাকেন, কখনো বাঘ তাঁকে নীচের ফেলে বুকের উপরে উঠে তাঁর গলায় কামড় দেবার চেষ্টা করে তিনি দুই হাতে বাঘের গলা টিপে ধরে সরিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তিনি কিন্তু সর্বক্ষণ বাঘের গলাটা দুই হাতে টিপে ধরে আছেন, কিছুতেই তাঁর গলার কাছে বাঘের মুখ এগুতে দিচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে শিকারবাহিনী ও ফণীন্দ্র নিকটে এসে পৌঁছেছেন যতীন্দ্রনাথ চীৎকার করে ফণীন্দ্রকে বল্লেন, "ফটিক, গুলি কর।" কিন্তু ফণীন্দ্র গুলি করবেন কি করে? বাঘে-মানুষে এমন জড়াজড়ি করে মল্লযুদ্ধ চলছে যে গুলি করা অসম্ভব, গুলি বাঘকে না লেগে মানুষকেও লাগতে পারে। ফণীন্দ্র আর্তস্বরে চীৎকার করে বললেন "বড়দা, গুলি করতে পারছি না, তোমার গায়ে লেগে যেতে পারে।"

তখন যতীন্দ্রনাথের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী যুবক হৃষিকেশ

ডাক্তার চীৎকার করে মনে করিয়ে দিলেন, "বড়দা, তোমার শার্টের পকেটে ছুরি আছে, বার করে নাও।"

যতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ শুধু বাঁ হাত দিয়ে বাঘের গলা টিপে ধরে ডান হাতে পকেটের ছুরিটা বার করলেন, এবং দক্ষিণ হাতে ছুরির বাঁট ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছুরিখানি খুলে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুরির সবখানি বাঘের গলায় বসিয়ে দিলেন। ছুরির আঘাতে বাঘ উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং চারখানি থাবা দিয়ে যতীন্দ্রনাথের দেহ আঁচড়াতে আরম্ভ করল। তাঁর এক উরুর বৃহৎ মাংসপেশীখানা (fremer muscle) ছিঁড়ে উল্টে গেল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথ ছুরির আঘাতে আঘাতে বাঘের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটালেন। বাঘ যখন মুমূর্ষু হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তখন সকলে ছুটে এগিয়ে গেল। তখন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝুঁঝিয়ে রক্তস্রাব হচ্ছে। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে এনে শুইয়ে দিল। গ্রামের ডাক্তার যুধিষ্ঠির বিশ্বাস ছুটে এসে তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন, তাঁর উরুতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করলেন। তখন বেলা প্রায় দশটা। সাব্যস্ত হোল যে, যতীন্দ্রনাথকে চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। তৎক্ষণাৎ লোক ছুটল তিন মাইল দূরে গড়াই নদীর অপর পারে কুষ্টিয়া স্টেশনে। বৈকাল চারটায় চাটগাঁ মেল ট্রেন আসে, ঐ ট্রেনে আহত যতীন্দ্রনাথকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করতে হবে। তখন কুষ্টিয়ার স্টেশন মাস্টার ছিলেন একজন ইংরাজ। তিনি খুব সাহায্য করেছিলেন।

বেলা প্রায় দুটোর সময়ে একখানা বড় পানসী নৌকাতে আহত যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর মামাত ভাইয়েরা রওনা হলেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ঘাটে এসে ভেঙে পড়ল। সকলেরই চক্ষু সজল।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তিনি তাঁদের পদধূলি মাথায় নিলেন। কনিষ্ঠেরা সকলে তাঁকে প্রণাম করল, তিনি তাদের সকলকে অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় কিরে, আবার ভাল হয়ে ফিরে আসব।"

গ্রামবাসী সকলের শুভেচ্ছা সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় রওনা হলেন।

কলকাতায় এনে যতীন্দ্রনাথকে রাখা হোল তাঁর সেজমামা ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শোভাবাজারের বাসাতে। তখনকার দিনের কলকাতার প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারীকে যতীন্দ্রনাথের চিকিৎসার ভার দেওয়া হোল। ডাঃ সর্বাধিকারী অতি যত্নের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। ডাঃ সর্বাধিকারী চিকিৎসার জন্য কোন অর্থই গ্রহণ করলেন না। বললেন, "এ ছেলে দেশের গৌরব। মল্লযুদ্ধ করে কেবলমাত্র একটা কলম-কাটা ছুরি দিয়ে যে একটা এত বড় বাঘ মেরেছে, তার চিকিৎসা করে আবার অর্থ নেব কি! একে যদি ভাল করে তুলতে পারি সেই ত' আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

ডাঃ সর্বাধিকারী অর্থ নিলেন না। যতীন্দ্রনাথ ভাল হয়ে উঠে নিহত বাঘের চামড়াটা ডাঃ সর্বাধিকারীকে উপহার দিয়েছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ যেদিন জখম হয়ে কলকাতায় এলেন, তার আট দিন পরে সহসা তাঁর গুরুদেব ভোলানন্দ গিরি হরিদ্বার থেকে শোভাবাজারে তাঁর মাতুলের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই যতীন্দ্র-নাথের পাশে গিয়ে বসলেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "বেটা, ভাল হয়ে যাবি।" সেইদিন ভোলানন্দ মহারাজ সারাদিন যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কাটালেন, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। সারাদিন সেই ঘরে তিনি পূজা হোম ধ্যান করলেন।

পরদিন সকালে মহারাজ বললেন, "ওকে কালো গরুর দুধ খেতে দাও ; যত পারে তত খাক।" খুঁজে খুঁজে গোয়াবাগানের খাটাল থেকে কালো গরু বার করা হোল, তার দুধ যতীন্দ্রনাথকে পেট ভরে খাওয়ান হতে লাগল, তিনিও দিনে দিনে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।

প্রায় মাসাধিককাল চিকিৎসার পরে যতীন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

যতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে কয়ায় ফিরে এলেন। সমস্ত কয়া গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সকলেই তাঁকে দেখতে আসতে লাগল। তিনিও সকলের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দেখা করে বেড়াতে লাগলেন।

যতীন্দ্রনাথকে তাঁর চতুর্থ মাতুল অনাথ চট্টোপাধ্যায় একদিন বললেন, "তোকে বাঘের ঘায়েল থেকে বাঁচাতে পারা গেল বটে, কিন্তু সিঙ্গীর ঘায়েল থেকে বাঁচান যাবে না।"

অনাথবাবু "সিঙ্গী" অর্থে ব্রিটিশ সিংহকেই অবশ্য নির্দেশ করে-ছিলেন। মাতুলের আশঙ্কাই যতীন্দ্রনাথের জীবনে অবশেষে সত্য হোল।

বীর সাভারকর

১৯০৫ সাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন গুপ্তসমিতিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠল। এই সমিতিগুলি তখন লেগে গেল গোপনে রিভলবার, পিস্তল সংগ্রহ ও বোমা তৈরি করতে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ও প্রাণ বিসর্জন করতে প্রস্তুত তরুণ বিপ্লবী সৈনিক সংগ্রহ করার কাজে। একদিকে চাই বোমা আর পিস্তল, মারণাস্ত্র—যা' দিয়ে ইংরেজকে মারতে হবে ; আর একদিকে চাই হাজার-হাজার বিপ্লবী সৈনিক—যারা একহাতে পিস্তল আর এক হাতে পটাসিয়াম সায়েনাইড নিয়ে এগিয়ে যাবে। ইংরেজের বুকে ডান হাতের পিস্তল গর্জন করে উঠবে—গুড়ুম্! আর পুলিসের হাতে পড়বার পূর্বেই বাঁ-হাতের পটাসিয়াম সায়েনাইড দেবে মুখে ফেলে। আত্মহত্যা করা সম্ভবপর না হ'লে ফাঁসির রশি হাসতে হাসতে গলায় পরে নেবে, যত রকম বীভৎস পীড়ন আর অত্যাচার দেহের উপরে চলুক, সমস্তই বোবা হয়ে সহ্য করবে, পরিশেষে মরে যাবে—তবু কিছুতেই মুখ খুলবে না, পুলিসের কাছে দলের কোন সংবাদ প্রকাশ করবে না—এমনিতর দুর্জয় বীর বিপ্লবী সৈনিক চাই সহস্র সহস্র—পিতা, মাতা, ভাইবোন, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে চলে আসতে হবে, ভোগ-সুখ-ঐশ্বর্য-আনন্দ-বিলাস সব ত্যাগ করতে হবে। বর্তমানের সুখ, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনাকেও বিসর্জন দিতে হবে—দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা ও প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর কোন কামনা জীবনে থাকবে না ; প্রাণ বিসর্জন দেবার পরেও কোন বাহবা, কোন পুরস্কার দেশবাসীর কাছে মিলবে না। কোন সম্বর্ধনা হবে না, শোক-সভা হবে না ; পরাধীন ক্রীতদাসের

দেশে কেউ 'আহা' অবধি বলবে না। সম্পূর্ণরূপে Unwept, unhonoured and unsung'—প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে—এমনতর নিষ্কামদর্শী বিপ্লবী সৈনিক চাই সহস্রে সহস্রে। এই ছিল সেদিনকার গুপ্তসমিতির কাজ। অস্ত্র সংগ্রহ করা, বিপ্লবী সৈনিক সংগ্রহ করা এবং উভয় সংযোগে ইংরেজকে দূর করা। ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়ান, আর ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন করা—এই ছিল গুপ্তসমিতির আদর্শ।

"নিবারিতে অত্যাচারে, বোমা অস্ত্র হয়েছে-রে—
দেশভক্ত এতে করে, শোধ লও হে অত্যাচারে—"

এই ছিল সেদিন গুপ্তসমিতির স্লোগান।

গুপ্তসমিতির আন্দোলন বাঙলায়, মহারাষ্ট্রে ও পাঞ্জাবে প্রসারিত হতে লাগল।

মহারাষ্ট্রের গুপ্তসমিতির হোতা ছিলেন বীর সাভারকর—বিনায়ক দামোদর সাভারকর। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাভারকরের অবদান অপরিমেয়। এত বড় বীর, কৌশলী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনীষী বিপ্লবী ভারতে অল্পই জন্মেছেন। সাভারকরের ইংরাজী ভাষায় রচিত সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাস এক অমর গ্রন্থ। ভারতের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের মনে অন্য কোন গ্রন্থ এই গ্রন্থের মত প্রভাব ও প্রেরণা সঞ্চার করেছে বলে আমার জানা নেই। একদিন এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানিকে হস্তগত করবার জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি সমস্ত গোয়েন্দাবিভাগ নিযুক্ত হয়েও ব্যর্থ হয়েছিল। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট জানতে পেরেছিল যে, সাভারকর এই গ্রন্থ রচনা করে ভারতবর্ষে প্রকাশ করা অসম্ভব বোধে ইংলণ্ডে গেছেন—সেখান থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করবেন বলে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট

গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পূর্বেই তাকে বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করলেন এবং ইংলণ্ডের সর্বত্র তন্ন-তন্ন করে তল্লাসী আরম্ভ করে দিলেন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রেপ্তার করার জন্য। সাভারকর ইংলণ্ডের সমস্ত গোয়েন্দাবিভাগের চোখে ধূলি দিয়ে তাঁর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে পালিয়ে গেলেন ফ্রান্সে। ফ্রান্সে তিনি গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ করেছেন, এমন সময় বৃটিশ গোয়েন্দাবিভাগ ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ও গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে ফ্রান্সে গিয়ে হানা দিলেন। সাভারকর পাণ্ডুলিপি নিয়ে পালিয়ে গেলেন জার্মাণীতে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ ধাওয়া করলেন জামাণীতে, সাভারকরও পালিয়ে গেলেন দেশান্তরে। এমনি করে দেশ হতে দেশান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি তাঁকে সংগোপনে সন্তর্পণে অনুসরণ করেছে, আর তিনি ক্রমাগত তাদের চোখে ধূলি দিয়ে দেশ হতে দেশান্তরে পাণ্ডুলিপি নিয়ে পালিয়ে গেছেন। অবশেষে ইউরোপের হল্যাণ্ড হতে তিনি উক্ত গ্রন্থ ছাপিয়ে ইউরোপের সর্বদেশে—আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যেখানে-যেখানে ভারতীয় ছাত্র ছিল, ভারতীয় ব্যবসায়ী ছিল, তাদের কাছে গোপনে পাঠিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষেরও সর্বত্র তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর গ্রন্থ। পাঞ্জাবে তিনি তাঁর গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন পরবর্তী জীবনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মস্ত সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক এবং পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকন্দর হায়াৎ খানের মারফত। তরুণ সেকেন্দর হায়াৎ খান তখন ব্যারিস্টারী পড়া শেষ করে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে আসছিলেন, তাঁরই সঙ্গে সাভারকর তাঁর গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন পাঞ্জাবে।

এই বীর সাভারকরই মহারাষ্ট্রে গুপ্তসমিতি আন্দোলন সংগঠন করলেন। বাঙলায় গুপ্তসমিতির নেতারা সেদিন বাঙলার ছেলেদের উৎসাহিত করবার জন্য বলতেন—মহারাষ্ট্র আমাদের চেয়েও এগিয়ে

যাচ্ছে, আমাদের শক্তি বাড়াও—বাঙলা যেন মহারাষ্ট্রের চেয়ে পেছিয়ে না থাকে। বাঙলায় তখন গুপ্তসমিতি আন্দোলন হুহু করে বেড়ে চলেছে। যুগান্তর দলের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে কলকাতার মানিকতলাতে, বারীন ঘোষের মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে। এইখানে বারীন্দ্র ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তখন খুব সক্রিয়; চারিদিকে তাঁরা ছেলে রিক্রুট করছেন, দলের শক্তি বৃদ্ধি করছেন। যুগান্তর দলের মেদিনীপুর শাখাও তখন খুব সক্রিয়। স্বনামধন্য ৺রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন বসুর নেতৃত্বে ওখানকার সমিতি খুব ব্যাপকতা লাভ করে চলেছে। অনুশীলন সমিতি পুলিন দাসের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় প্রসারিত হয়েছে। পুলিনবাবু শ্রীরামপুরের পর্টু গীজ-জাতীয় জগৎ-বিখ্যাত অসি ও লাঠি খেলোয়াড় মুর্তাজা সাহেবের কাছে লাঠিখেলা শিখেছিলেন। অসি ও লাঠিতে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। পুলিনবাবু পূর্ববঙ্গের সর্বত্র শত শত অসি ও লাঠি খেলার আখড়া স্থাপন করেছিলেন এবং এই সকল আখড়া থেকে চলত অনুশীলন সমিতির লোকসংগ্রহ। হাজার-হাজার বিপ্লবী সৈনিক পূর্ববঙ্গে সৃষ্ট হল সেদিন অনুশীলন সমিতির উত্তোগে। বিপিন গাঙ্গুলী 'আত্মোন্নতি সমিতি' দল গড়ে তুললেন কলকাতার মলঙ্গা লেনে, বরানগরে এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার কয়েক স্থানে। সরলা দেবীচৌধুরাণীর নেতৃত্বে গঠিত হল আর একটি বিপ্লবী দল—সুহৃদ্-সমিতি। কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে সুহৃদ্-সমিতি কাজ করতে লাগল।

বরিশালে একটি বিপ্লবী দল গড়ে উঠল; মাদারীপুরে একটি বিপ্লবী দল গড়ে উঠল পূর্ণ দাসের নেতৃত্বে; বগুড়ায় একটি যতীন

রায়ের নেতৃত্বে। বাঘা যতীন কলকাতা, ২৪-পরগণা, হুগলী, নদীয়া, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে বহু বিপ্লবী অনুচর তৈরী করলেন। তাঁর অনুচরদের মধ্যে অনেকেই খুব প্রতিভাশালী ও বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা হয়েছিলেন। স্বনামধন্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ (যিনি আমেরিকায় গিয়ে বহু বৎসর ছিলেন), অবনী মুখার্জী (সিঙ্গাপুরে যাঁর ফাঁসি হয়), খুলনার কিরণ মুখোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, যশোহরের বিজয় রায়, ভূপেন্দ্র দত্ত, বিভূতি দেবরায়, অমরেশ কাঞ্জিলাল, সত্যেন সেন (বৈপ্লবিক কাজে আমেরিকায় যান), মোহিনী মজুমদার, ভবভূষণ মিত্র, অতুল ঘোষ, নদীয়ার সুরেশ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা,) ক্ষিতীশ সান্যাল, ফণী রায়, অমিয় চক্রবর্তী, জ্যোতিষ পাল, পাবনার আশু লাহিড়ী, বগুড়ার যতীন রায়, হুগলীর ভূপতি মজুমদার, মাদারীপুরের চিত্তপ্রিয় রায় (বালেশ্বরের যুদ্ধে নিহত হন), ঢাকার বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত (শামসুল আলমকে হত্যা করিয়া ফাঁসি যান) প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের হাতেগড়া শিষ্য।

পাঞ্জাবেও গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল। লালা হরদয়াল, সর্দার অজিত সিং প্রভৃতি ছিলেন পাঞ্জাবের হোতা। পাঞ্জাবে গড়ে উঠল বিপ্লবী দল—'গদর পার্টি'। আমেরিকার যে সকল শহরে প্রবাসী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ছিলেন, সেখানেও গদর পার্টির শাখা বিস্তৃত হয়েছিল।

বিপ্লবী জীবন

১৯০৭ সালে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের জন্য গভর্ণমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দের নামে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করেন। সংশ্লিষ্ট রচনাটি যে অরবিন্দের লেখা তাহা প্রমাণ করার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বন্দেমাতরম্"-এর অন্যতম লেখক বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষী মানলেন।

মামলার শুনানীর দিনে আদালতে লোকে লোকারণ্য। বিপিনবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিলেন না, মুখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইলেন। গভর্ণমেণ্টের উকীল যতই তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, তিনি একটি কথারও উত্তর দিলেন না! তখন ম্যাজিস্ট্রেট বিপিনবাবুকে আদালতকে অপমান করার জন্য (for contempt of court) ছ'মাসের কারাদণ্ড দিলেন। বিপিনবাবুর জেল হয়ে গেল, কিন্তু প্রমাণ অভাবে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেন। সেদিন প্রকাশ্যভাবে ইংরেজের আদালতকে অমান্য করতে এবং নিজে কারাবরণ করে অরবিন্দকে নিরাপদ করাতে বিপিনবাবুর জনপ্রিয়তা অভাবনীয়রূপে বেড়ে গেল এবং দেশের লোকের মনে অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল। সেদিন আদালত প্রাঙ্গণে এত জনসমাবেশ হয়েছিল যে জনতা নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। একজন ইংরেজ সার্জেণ্ট সুশীল সেন নামে একটি কিশোরকে প্রহার করে, সুশীলও সার্জেণ্টটিকে পাল্টা প্রহার করে। সুশীলকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারক কিংসফোর্ড সাহেব সার্জেণ্টকে প্রহার করার অপরাধে সুশীলকে পনর ঘা বেত্রদণ্ড দেয়।

কিংসফোর্ড সাহেবকে গভর্ণমেণ্ট নিরাপদ করবার জন্য কলকাতা

থেকে সরিয়ে দেন; মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট করে বদলী করেন।

বিপ্লবীদের সভাতে কিংসফোর্ডের বিচার করা হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার ভার পড়ে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর উপরে।

ক্ষুদিরামের তখন বয়স উনিশ বৎসর মাত্র। তার বাড়ি মেদিনীপুরে। ক্ষুদিরাম ছিল মেদিনীপুরের বিপ্লবী কর্মী সত্যেন বসুর শিষ্য ও হাতেগড়া ছেলে। প্রফুল্ল চাকীর বাড়ি উত্তরবঙ্গে, সেও খুব তরুণ বয়স্ক। প্রফুল্ল ছিল খুব জোয়ান বলিষ্ঠ ছেলে। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বোমা ও পিস্তল সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল মজঃফরপুরে। মজঃফরপুরে গিয়ে তারা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বাড়ি ভাল করে চিনে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগল। তারা স্থির করল যে কিংসফোর্ড যখন বৈকালে ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে ফিটনে চড়ে ফিরে আসে, সেই সময়ে তারা তার গাড়িতে বোমা ফেলে তাকে হত্যা করবে। একদিন যথাসময়ে উভয়ে হাতে বোমা নিয়ে রাস্তার ধারে একটা গাছে চড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। যথাসময়ে দূরে দেখা গেল যে কিংসফোর্ডের গাড়ি আসছে। তখন উত্তেজনায় দুজনেই অধীর। গাড়ি যেমন নিকটে এসেছে অমনি গাড়ির উপরে বোমা ছুঁড়ে দিয়েছে। বোমা পড়বামাত্র দারুণ শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে সে যেন এক প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। বোমা ছুঁড়ে দিয়েই দু'জনে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে দে ছুট্। ওদিকে গাড়িতে সেদিন কিংসফোর্ড ছিল না—ছিল মিসেস ও মিস কেনেডি নামে দুজন ইংরেজ মহিলা। দুজনেই বোমার আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল

বোমা ছুঁড়ে দিয়েই প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পলায়ন করে। দুজনে দুদিকে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস ওদের গ্রেপ্তার করার জন্যে

চারদিক তোলপাড় করতে লাগল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বিপ্লবীদল সম্বন্ধে খুব সচেতন হয়ে উঠল। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রফুল্ল চাকী, পুলিসের লোক তাকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত দেখে, মোকামা স্টেশনের প্লাটফর্মের উপরে রিভলবার দিয়ে নিজের মুখের ভিতরে তালুতে গুলি করে আত্মহত্যা করল। বিপ্লবী বীর শত্রুহস্তে ধরা পড়বার আগে শত্রুর নাগালের বাইরে চলে গেল।

উইনি স্টেশনের কাছে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে। মজঃফরপুরেই তার বিচার হয়। ক্ষুদিরামের বিচার পরাধীন ভারতের বুকে এক অভাবনীয় উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রল। ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠে দেশের লোককে যেন শুনিয়ে গেল :

"এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল।

* * *

মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল॥"

মজঃফরপুরের বোমাবর্ষণের পরেই গভর্ণমেণ্ট দেশের চতুর্দিকে খানাতল্লাসী করে বিপ্লবী আন্দোলনের ও গুপ্ত সমিতির ঘাঁটি আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। কলকাতা মানিকতলায় মুরারীপুকুর বাগান তল্লাসী করে বিপ্লব আন্দোলনের এক প্রধান ঘাঁটি আবিষ্কার করে ফেলল। এখানে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গেল। এখান থেকে, কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে এবং বিভিন্ন জেলা থেকে খানাতল্লাসী করে গভর্ণমেণ্ট বহু বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্র বসু, কানাইলাল দত্ত, চারুচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি

প্রায় জন ষাটেক গ্রেপ্তার হলেন, এবং গভর্ণমেণ্ট এঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করে দিল। এই মামলা 'মানিকতলা বোমার মামলা' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। এই মামলার বিচার হয়েছিল আলিপুর আদালতে ইংরেজ জজ বীচ্‌ক্রফটের এজলাসে।

মানিকতলা বোমার মামলা ১৯০৮ সালে আরম্ভ হয় এবং প্রায় দুবৎসর পরে শেষ হয়। মামলা আরম্ভ হবার পরেই ধৃত আসামীদের মধ্যে শ্রীরামপুর নিবাসী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নিজে মুক্তিলাভ করার আশায় রাজসাক্ষী হয়ে সকল আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। নরেন গোস্বামীর এই বিশ্বাসঘাতকতায় আসামীগণ ও তাঁদের আত্মীয়গণ মনে মনে প্রমাদ গণলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, এই বিশ্বাসঘাতক নিজের মুক্তিলাভের জন্য দলের সম্বন্ধে সমস্ত গোপন কথা গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রকাশ করে দেবে এবং সাক্ষ্য দিয়ে অনেককে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবে। দেশের লোকের মনেতেও নরেন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকায় বিলক্ষণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। চন্দননগর নিবাসী ধৃত আসামী কানাইলাল দত্তের জননী একদিন তাঁর গৃহে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করতে করতে বললেন, "এমন কি দেশে কেউ নেই যে এই বিশ্বাসঘাতকটাকে শেষ করে দিতে পারে ?" কে সেদিন কল্পনা করেছিল যে, মর্মাহত জননীর অন্তরের গূঢ় অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য নিজের জীবন আহুতি দিয়ে এগিয়ে আসবে তাঁরই আপন জঠরের সন্তান ?

কানাইলালের তখন বয়স মাত্র একুশ বৎসর। দলের মধ্যে সে ছিল একজন মুখচোরা ছেলে, দেহটাও ম্যালেরিয়ার আক্রমণে রুগ্ন। তার দ্বারা যে কোন অসমসাহসিক কাজ হতে পারে একথা সেদিন দলের নেতারা কেউই মনে করেন নি। জেলখানার মধ্যে কানাই ও সত্যেন গোপনে যুক্তি করে স্থির করল যে বিশ্বাসঘাতকটাকে খতম

করে দিতে হবে। তারা দুজনেই এই কাজ করবে সংকল্প করল এবং সঙ্গোপনে তার আয়োজন করতে লাগল। প্রথম জিনিস হচ্ছে অস্ত্র —রিভলবার চাই। গভর্ণমেন্টের জেলখানায় বসে শত প্রহরীর সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে রিভলবার সংগ্রহ করা—একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বিপ্লবীর অভিধানে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই। অতএব জেলখানার ভিতরেই বাইরে থেকে রিভলবার আনাতেই হবে। কিন্তু বাইরে থেকে যে জেলখানার মধ্যে বিপ্লবী রাজবন্দীর হাতে রিভলবার এনে দেবে, সে কে? কোন রকমে ধরা পড়লেই ত তাঁর ফাঁসি। নিশ্চিত ফাঁসির দড়িটি গলায় পরতে প্রস্তুত হয়ে জেলখানার শত সতর্ক পুলিস ও গোয়েন্দা প্রহরীর দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করে কে এই রিভলবার সরবরাহ করে যাবে?

বিপ্লবীর সহায় বিপ্লবী—তা ছাড়া আর কে এই কাজের ভার নেবে! ভার নেবার লোকের অভাব হোল না। চন্দননগরের বিপ্লবী কর্মী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকে একটি করে রিভলবার এনে আলীপুর জেলখানার, চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে'* পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

তার পরে একদিন জেলখানার মধ্যে সত্যেন আর কানাই-এর হাতে সেই অগ্নিনালিকা গর্জন করে উঠল। প্রথমে সত্যেন গুলি করেছিল, কিন্তু সে গুলি এড়িয়ে গিয়ে নরেন গোঁসাই দৌড়ে পালায়, সঙ্গে সঙ্গে কানাই তার পশ্চাদ্ধাবন করে তার পিঠে গুলি করে। গুলি খেয়ে নরেন ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, তখন কানাই নিকটে এসে নরেনের দেহের উপরে তার রিভলবারের সবগুলি গুলিই একে একে বর্ষণ করে।

* যে ওয়ার্ডে বোমার মামলার আসামীরা আবদ্ধ ছিলেন, সেই ওয়ার্ডের নাম ছিল 'চুয়াল্লিশ ডিগ্রি'।

কানাই-এর শিক্ষক চন্দননগরের বিপ্লবগুরু চারুচন্দ্র রায় তখন মামলার একজন আসামী; তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি নরেনকে মারবার সময়ে বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে কানাই? নৈলে সবগুলো গুলিই কেন নরেনের উপর ঝাড়লে? একটা নিজের জন্য রাখলে না কেন?" কানাই উত্তর দিয়েছিল, "না মাস্টার মশাই, আমি মোটেই উত্তেজিত হইনি। আমাদের বিপ্লবীদের গুলি ইতিপূর্বে অনেকবার narrow escape হয়ে ফসকে গেছে, তাই আমি সবগুলো গুলিই নরেনকে ঝেড়েছি, যেন narrow escape না হয়; কারণ নরেনকে অবশ্যই মারা চাই,—I wanted to do it and I did it."

নরেনকে হত্যা করার জন্য বিচারে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসির হুকুম হল। বিচারকের রায় শুনে কানাই হেসে বলে উঠল, "বাঁচা গেল! সারাজীবন দ্বীপান্তর খাটার চেয়ে দুর্গা বলে ফাঁসিতে ঝুলে পড়া ঢের ভাল।" কানাইকে হাসতে দেখে যে সার্জেণ্টটি তাকে পাহারা দিচ্ছিল সে বলে উঠল, "তোমার এ হাসি ফাঁসিতে ওঠবার সময়ে আর থাকবে না—Your face will then become pale." ("তোমার মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে যাবে।")

ফাঁসির দিন ভোরবেলা প্রহরী কানাইকে তার সেল থেকে আনতে গিয়ে দেখে যে কানাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওজন নিয়ে দেখা গেল যে ফাঁসির হুকুম হবার পরে এক সপ্তাহে তার ওজন পাঁচ পাউণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। কানাই ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে ভগবানের নাম করে প্রসন্নমনে হাসি গল্প করতে করতে প্রহরীর সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল। দৃঢ় পদে মঞ্চে আরোহণ করল। তারপর যখন তার মাথায় ঢাকনা পরিয়ে দিয়ে মুখ ঢেকে দেওয়া হোল, তখন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে সে সহাস্যে সেই সার্জেণ্টটিকে ডেকে

জিজ্ঞাসা করল, "Mr.—are you here ?" সার্জেন্ট সাড়া দেওয়াতে কানাই হেসে তাকে বললে, "How do you see me, do I look pale ?" ("তুমি এখন আমাকে কেমন দেখছ ? আমাকে কি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ?") সেই বিদেশী সার্জেন্টের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল। সে এসে সঙ্গীদের বলেছিল, "Kanai mounted the gallows with steps firmer than mine. Oh ! I have seen my Christ to be hanged this morning." ("কানাই আমার চেয়েও দৃঢ় পদবিক্ষেপে ফাঁসি-মঞ্চে উঠেছিল। আহা! আজ সকালে আমি যেন আমার যিশুখৃষ্টকেই ফাঁসিতে প্রাণ দিতে দেখেছি।")

কানাই-এর মতই নিভীকভাবে সত্যেন ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছিল। সত্যেন সম্বন্ধে সার্জেন্টটি বলেছিল—"Kanai was very brave but Satyen was braver." ('কানাই খুবই সাহসী, কিন্তু সত্যেন আরও সাহসী।") সত্যেন লাফাতে লাফাতে ফাঁসির মঞ্চে উঠে নিজে হাতে ফাঁসির দড়ি টেনে নিয়ে গলায় পরেছিল। কানাই ও সত্যেনের ফাঁসিতে দেশের লোকের মনে এক অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিল। মামলার বিবরণ সংবাদপত্রে বেরুতে লাগল, আর সেই সব সংবাদ পাঠ করে বাঙলাদেশের লোকের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠতে লাগল। প্রায় দুই বৎসর শুনানী চলবার পরে আলীপুর বোমার মামলার যবনিকাপাত হোল। মামলার প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নির্দোষী বলে মুক্তি লাভ করলেন। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম হোল, আর উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র দাস, বিভূতি সরকার, ইন্দুভূষণ রায়, শৈলেন বসু, ইন্দ্রনাথ নন্দী, বীরেন সেন, সুধীর ঘোষ প্রভৃতির যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর দণ্ড হোল। বাকী অনেকের দশ বৎসর ও সাত বৎসর দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। মোট উনচল্লিশজন দণ্ডিত হন ও সতের জন মুক্তিলাভ করেন। পরে হাইকোর্টে আপীল করলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ পরিবর্তিত হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ বহাল থাকে--অনেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের বদলে দশ বছব দ্বীপান্তর হয় এবং কেহ কেহ ছাড়া পান। চন্দননগরের বিপ্লবগুরু এবং কানাইলাল ও উপেন্দ্রনাথের শিক্ষক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ফরাসী প্রজা বলে আন্তর্জাতিক আইনের বিধানে অব্যাহতি পান।

'মানিকতলা বোমার মামলা'র ফলে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলন এক প্রচণ্ড আঘাত পেল। বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ, অবিনাশ চন্দ্র, হেমচন্দ্র দাস, সত্যেন বসু—এঁরা সকলেই ছিলেন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভাশালী বিপ্লবী নেতা; এঁদের দ্বীপান্তর হয়ে গেল এবং সত্যেন বসুর ফাঁসি হয়ে গেল। এঁরা সকলে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন এবং তার ফলে বিপ্লবী সংগঠনে একটা বিশৃঙ্খল দিশেহারা অবস্থার সৃষ্টি হোল। এর পরে আবার শ্রীঅরবিন্দ কারাগার হতে মুক্তিলাভ করবার পরে দেখলেন যে, তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক কারাদণ্ডিত হয়ে বর্মার জেলে প্রেরিত হয়েছেন, বিপিনবাবু বিলাতে গেছেন ভারতের রাজনৈতিক দাবী প্রচার করতে এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের আটক আইনে আবদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দ উত্তর-পাড়াতে, কলকাতায় বিডন স্কোয়ারে ও বরিশাল জেলার ঝালকাটিতে রাজনৈতিক বক্তৃতা করলেন এবং বাংলা ভাষায় 'ধর্ম' ও ইংরাজী ভাষায় 'কর্মযোগীন' নামক দুইখানি পত্রিকা প্রকাশ করে আবার জাতীয়তা-

বাদের প্রচার আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সিস্টার নিবেদিতা তাঁকে সংবাদ পাঠালেন যে, পুলিশ আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করবার আয়োজন করছে। তিনি তখন সঙ্গোপনে কলকাতা থেকে চন্দননগরে চলে আসেন এবং কিছুদিন চন্দননগরে বিপ্লবী শ্রীমতিলাল রায় ও তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় আত্মগোপন করে বাস করেন এবং পরে মতিলাল রায়—অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর নিজের মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্রের সাহায্যে 'সৌমেন ঠাকুর' ছদ্মনামে ফরাসী ষ্টীমার 'Dupleix' যোগে পণ্ডিচেরি চলে যান এবং সেখানে ফরাসী রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে (Political Refugee) বাস করতে থাকেন এবং যোগসাধনা গ্রহণ করেন।

পুলিশ যখন মানিকতলার বাগান খানাতল্লাসী করে, তখন সেখানে পাওয়া গিয়েছিল বোমা তৈরির যন্ত্রপাতি, ডিনামাইট, বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র এবং বোমা তৈরি ও গুপ্তসমিতি সংগঠন শিক্ষার বই ও কাগজ-পত্র।

বিপ্লবীরা দেশের চারদিকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। ১৯০৫।৬ সাল থেকেই ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে বৈপ্লবিক কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। বি. এন. আর লাইনের নারায়ণগড় স্টেশনে ছোট লাটের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেবার জন্যে যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা ডিনামাইট পাতেন, কিন্তু কার্যকালে ডিনামাইট ভাল করে ফাটল না, প্রকাণ্ড একটা শব্দ হোল আর লাটের গাড়িটা একটু দুলে উঠল মাত্র, লাট সাহেব বহাল তবিয়তে চলে গেলেন। পুলিশ তদন্ত করে গোটাকতক নির্দোষী কুলীকে ধরে চালান দিল এবং আদালতে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণে কুলীদের অপরাধ প্রমাণ হয়ে সাত বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হোল। মানিকতলা বোমার মামলা চলবার সময়ে বারীন্দ্রকুমার তাঁর জবানবন্দীতে এই

ট্রেন ওড়াবার রহস্য প্রকাশ করে বলেন এবং ওটা যে তাঁদেরই কাজ তা ব্যক্ত করে বলার পরে ঐ নির্দোষী কুলীগুলোকে গভর্ণমেণ্ট জেল থেকে ছেড়ে দেন। অনেক সময়ে আদালতের বিচার যে কতখানি মেকী হয় আর পুলিসের সাজানো সাক্ষী যে অনেক সময়ে একেবারেই ভুয়ো হয়—এই ঘটনাই তার একটা দৃষ্টান্ত।

বিপ্লবীরা চন্দননগর ও মানকুণ্ডু স্টেশনেও লাটের গাড়ি ওড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হয়। কলকাতার Y. M. C. A. হলে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী জিতেন রায়চৌধুরী লাট সাহেব অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারকে পিস্তল দিয়ে গুলি করার চেষ্টা করেন। তিনি তাক করে পিস্তলের ঘোড়া টেপেন, কিন্তু ঘোড়াটা আটকে যায়। লাট সাহেব বেঁচে গেলেন, জিতেন রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়ে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন সাহেবকে বিপ্লবীরা গোয়ালন্দ স্টেশনে গুলি করেন, সাহেব আহত হয়ে পরে সেরে ওঠেন, মারা যাননি। কুষ্টিয়াতে পাদরী হিগেন্‌বোথামও গুলির ঘায়ে আহত হন কিন্তু মারা যাননি, বেঁচে ওঠেন। এই জন্যই কানাইলাল বলেছিলেন যে, "আমাদের সব চেষ্টাই narrow escape হয়ে যায়, তাই আমি আমার পিস্তলের সবগুলো গুলিই নরেনকে ঝেড়েছিলাম।"

মানিকতলা বোমার মামলা আরম্ভ হবার পর থেকেই যতীন্দ্রনাথ (বাঘা যতীন) খুব সক্রিয় হয়ে উঠলেন। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই তাঁর বিপ্লবী নেতৃ-জীবন আরম্ভ হয়। গভর্ণমেণ্ট বিপ্লবীদলের উপরে আক্রমণ আরম্ভ করে দিয়েছে—তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে গভর্ণমেণ্টের উপরে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে দিলেন।

বাঙালী দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফুল্ল চাকীকে মোকামা স্টেশনে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল। নন্দলাল প্রফুল্লকে

গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হলে প্রফুল্ল বলেছিল, "আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দেবেন ?" কিন্তু নন্দলাল নিরস্ত না হওয়াতে প্রফুল্ল তখন আপন পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে। প্রফুল্লর সেই অভিমান-পূর্ণ ব্যর্থ অন্তিম আবেদন—"আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দেবেন ?"—যতীন্দ্রনাথের হৃদয়ে শেলের মত বিঁধে-ছিল। তিনি আদেশ দিলেন দারোগা নন্দলালকে খতম কর। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে নন্দলাল কলকাতায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময়ে তাঁর বাড়ির নিকটে গলির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের এক বিপ্লবী শিষ্য নন্দলালের বুকে গুলি করে তাকে শেষ করলেন। গুলি খেয়ে নন্দলালের নিষ্প্রাণ দেহ রাস্তার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিশ্বাসঘাতকের রক্তে প্রফুল্লর বিদেহী আত্মার তর্পণ হোল। নন্দলালকে মেরে ঐ বিপ্লবী গলির ভিতরে নন্দলালের বাড়িতে গিয়ে চৌকাট থেকে চেঁচিয়ে বলে এল, "ওগো রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখ, তোমাদের নন্দলালের কি হয়েছে গো।"

আশুতোষ বিশ্বাস ছিলেন আলীপুর কোর্টের সরকারী উকিল। মানিকতলা বোমার মামলা পরিচালনায় ইনি সরকার পক্ষের একজন বড় কর্মকর্তা ছিলেন। বিপ্লবী দলের একজন ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী। যতীন্দ্রনাথ এঁকে শেষ করবার জন্যে পাঠালেন তাঁর নির্ভীক বিপ্লবী শিষ্য চারু বসুকে। চারু বসু দুপুরবেলায় আলীপুর আদালতে আশু বিশ্বাসকে গুলি করেন। আশু বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। চারু গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিচারের জন্য যখন দায়রা আদালতে মামলা আরম্ভ হোল, তখন চারু পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন, "No sessions trial, but hang me tomorrow." ("বিচার-ফিচারের দরকার নেই বাবা, এখুনি আমায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও। অনর্থক আর দেরি কেন? আমার কাজ

ত আমি সেরেই দিয়েছি, এইবার তোমাদের কাজ তোমরা শেষ করো।”

আশুতোষকে শেষ করে যতীন্দ্রনাথ নজর দিলেন সামশুল আলমের উপরে। সামশুল আলম ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট। মানিকতলা বোমার মামলা পরিচালনায় সরকার পক্ষের সবচেয়ে বড় করিতকর্মা লোক। প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন বোমার আসামীদের যেন অনেকগুলিকে ফাঁসিতে লটকাতে পারেন। মিথ্যা প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সৃষ্টি করার কার্যে একেবারে ধুরন্ধর। বোমার মামলার আসামীরা আদালতের খাঁচার ভিতরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে গান করত ঃ

ওহে সামশুল
তুমি সরকারের শ্যাম, আমাদের শূল।
কবে ভিটেয় তোমার চরবে ঘুঘু
তুমি চোখে দেখবে সরষের ফুল॥

বিপ্লবী বন্দী সহকর্মীরা জেলের খাঁচায় বসে তাঁদের কামনা জানাচ্ছেন 'কবে সামশুল চোখে সরষের ফুল দেখবে।' যতীন্দ্রনাথ এই গুরুভার তুলে নিলেন স্কন্ধে। সামশুলকে প্রাণদণ্ড দিতেই হবে। মানিকতলা বোমার মামলার তদন্তের কর্তৃত্ব নিয়ে সে বিপ্লবীদের সর্বনাশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। তাছাড়াও যতীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য এবং বিপ্লবী-কর্মী-শিরোমণি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) ১৯০৭ সালে চিংড়িপোতা রেল-স্টেশনে ডাকাতি করে সরকারী টাকা লুট করেন, এবং ১৯০৯ সালে ডায়মণ্ড হারবারের সন্নিকটে 'নেত্রা' গ্রামে এক ডাকাতি করে টাকা নিয়ে আসেন। এই ডাকাতিতে টাকা নিয়ে চলে আসার সময়ে বিপ্লবীরা গৃহস্থকে বলে

আসেন—"এই অর্থ ইংরেজ-বিতাড়নের কার্যে ব্যয় হবে।" এই মামলার তদন্তও সামশুল আলম করে।

কিন্তু সামশুলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া বড় শক্ত কাজ। সে বড় ঝানু ঘুঘু। কিছুতেই তাকে পাওয়া যায় না। নন্দলাল বা আশু বিশ্বাসের মত সে সহজপ্রাপ্য নয়! সে সর্বদা অতি সাবধানে লুকিয়ে থাকে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাকে সদা-সর্বদা সতর্ক প্রহরার কৌটায় পুরে রাখে। তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু 'অসম্ভব' বাক্যটি বিপ্লবীদের অভিধানে লেখা থাকে না। যতীন্দ্রনাথের জীবনে অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। অসম্ভবকে সম্ভব করাই ত তাঁর কাজ।

ঢাকা জেলায় বাড়ি, উনিশ বছরের কিশোর বিপ্লবী-বীর বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথের প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য সে। বাপ-মা সার্থক নাম রেখেছিলেন তার বীরেন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই কিশোর বীর বীরেন্দ্রনাথ সামশুল নিধনের কঠিন কার্যভার গ্রহণ করল।

১৯১০ সালে ২৪শে জানুয়ারি তারিখে দ্বিপ্রহরে বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত ও সতীশ সরকার হাইকোর্টে এলেন। বীরেন সামশুল আলমকে চিনত না, সতীশ সরকার চিনতেন। বীরেনকে সতীশ সরকার সামশুলকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। বীরেন হাইকোর্টের প্রশস্ত বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল। সামশুল যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাচ্ছিলেন তখন বীরেন তাঁর সম্মুখে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি সামশুল আলম?" সামশুল সাধারণ স্বভাববশতঃ যেই বলেছেন 'হাঁ', অমনি সঙ্গে সঙ্গে বীরেন পকেট থেকে রিভলবার বার করে সামশুলের বুকে গুলি করল। চক্ষের পলকে সামশুল বারান্দার উপরে লুটিয়ে পড়লেন। চারিদিক থেকে রক্ষী প্রহরী চাপরাশী আরদালী প্রভৃতি

খুন খুন চীৎকার করে ছুটে এল বীরেনকে ধরতে। প্রথমে একজন সশস্ত্র কনেস্টবল ছুটে ধরতে আসে, কিন্তু তখনো বীরেনের রিভলবারে কয়েকটি গুলি অবশিষ্ট ছিল; সেই গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বীরেন বারান্দা দিয়ে নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগল, কিন্তু শীঘ্রই তার গুলি ফুরিয়ে গেল। তখন যারা তাড়া করে আসছিল, তারা পিছন দিক থেকে এসে তাকে ধরে ফেলল।

গ্রেপ্তার হবার পরে বীরেন পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের কোন উত্তর দিল না। সে বলেছিল, "কোন কথা আমি বলব না, তোমাদের যা ইচ্ছে করতে পার।" প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তার বিচার হয়। মামলাতে আত্মপক্ষ-সমর্থনের কোন চেষ্টাই সে করল না। সরকারী সাক্ষীরা যখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিয়ে তার ফাঁসির ব্যবস্থা করতে লাগল, সে তখন অত্যন্ত আমোদে কেবল হাসত। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বীরেনকে দায়রা সোপর্দ করলেন। হাইকোর্টে দায়রার বিচার শুরু হল। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স বিচার করেছিলেন। এখানেও বীরেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল ব্যারিস্টার দিল না। খুনী আসামীর বিরুদ্ধে একতরফা মামলা চলে না বলে গভর্ণমেণ্ট বীরেনের পক্ষ সমর্থন করার জন্য ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু বীরেন নিশীথ সেনকেও কোন কথা বলে নাই। নিশীথ সেন আদালতে বীরেনকে পাগল বলে ঘোষণা করেন; কিন্তু তাতে কিছু হোল না। বীরেনের ফাঁসির হুকুম হোল। অকম্পিত চরণে হাসতে হাসতে বীরেন আদালত থেকে বেরিয়ে এল।

পুলিস বীরেনের মুখ থেকে বিপ্লবীদলের সম্বন্ধে কোন সংবাদ, কোন তথ্যই বার করতে পারল না। শুধু বীরেনকে ফাঁসি দিয়ে ত তাদের কোন লাভ নেই, তার কাছে বিপ্লবী দলের গুপ্ত সংবাদ

সব জেনে নিতে পরলে—যাতে তারা বেড়াজালে সব বিপ্লবীকে ছেঁকে ধরে ফেলতে পারে—তবেইত তাদের লাভ; কিন্তু সে ত হোল না। কিন্তু যে ছেলে মরণকে পরোয়া করে না, তার কাছে ভয় দেখিয়ে, তাকে উৎপীড়ন (Torture) করে পুলিস কথা বার করবে কি করে? তখন পুলিস এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করল—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নিশাকর যে কৌশলে গোবিন্দলালের মনে রোহিনীর উপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে গোবিন্দলালকে রোহিনীকে হত্যা করতে প্ররোচিত করেছিল, পুলিস সেই জঘন্য কৌশল অবলম্বন করে বীরেনের মনে বিপ্লবী দলের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তার কাছে কথা আদায়ের চেষ্টা করল এবং তারা এই কৌশল অবলম্বন করে সফলকাম হোল।

পুলিস ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বীরেনের নির্জন 'সেল'-এ গিয়ে তাকে পুলিসের তৈরি এক মিথ্যা ও কৃত্রিম বিপ্লবী সংবাদপত্র দেখাল। ঐ সংবাদপত্রে লেখা ছিল যেন বাঙলার বিপ্লবী দলগুলি বীরেনকে ভীরু কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বলে নিন্দাবাদ করেছে এবং তার বিরুদ্ধে অনেক অ-কথা কু-কথা লিখে সকল বিপ্লবীকে তাকে ঘৃণা করতে বলছে! এই কৃত্রিম সংবাদপত্রখানি পড়ে বীরেনের একেবারে মন ভেঙে গেল, দারুণ মর্মদাহে সে পাগলপারা হয়ে গেল। পুলিস তাকে বলল, "দেখছেন, আপনি যাদের কথায় খুন করে ফাঁসি যাচ্ছেন, তারা আপনাকে কি বলছে?" বীরেন ভগ্নকণ্ঠে বলল, 'বলুক, যে যা ইচ্ছে বলুক, যার যত খুশি আমায় ঘৃণা করুক, আমি গ্রাহ্য করিনে, পৃথিবীতে অন্ততঃ একজন আছে যে আমায় ঘৃণা করে না, যে আমায় কিছুতেই বিশ্বাসঘাতক ভাববে না, যার ভালোবাসা থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত করেতে পারবে না—সেই

একজনের ভালোবাসাই আমার কাছে সমস্ত পৃথিবীর ঘৃণার চেয়েও শ্রেষ্ঠ—ওসব আমি গ্রাহ্য করি নে।"

পুলিস সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "কে কে, সে? কার কথা বলছেন আপনি?"

অভিমানে ক্রোধে তখন বীরেনের চৈতন্য লোপ পেয়েছে; বিপ্লবীদলের মন্ত্রগুপ্তি তখন সে বিস্মৃত হয়েছে। আহত সিংহশাবকের মতন গ্রীবা ফুলিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে সে উত্তর দিল,—"তিনি আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার নেতা যতীন্দ্রনাথ।"

পুলিস ন্যাকা সেজে মলিন হেসে বললে, "ও, আপনি যতীন মুখুজ্যের কথা বলছেন?"

বীরেন পুনরায় দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিল, 'হাঁ'।

ব্যস্! পুলিসের অর্ধেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেল। তারা সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণবদনে মলিন হেসে বললে, "আর বলবেন না আপনার নেতা যতীন মুখুজ্যের কথা। তিনিই ত সবচেয়ে আপনাকে বেশী ঘৃণা করেন। তবে আর বলছি কি আপনাকে; সব কথা শুনুন, সব দেখুন।"

পুলিস তখন নানাপ্রকার মিথ্যা কথা বলে, জাল (পুলিসেরই ছাপান) বিপ্লবী পত্রিকাদি দেখিয়ে বীরেনকে বুঝিয়ে দিল সকল বিপ্লবী মায় যতীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাকে ঘৃণা করেন ও বিশ্বাসঘাতক মনে করেন। বীরেনের আগেই মন ভেঙে গিয়েছিল, এখন তার শেষ সান্ত্বনাটুকু নিঃশেষ হয়ে গেল। সমস্ত পৃথিবী তার চোখে নিবিড় অন্ধকারময় মহাশূন্যে পরিণত হোল—আঁধার, আঁধার, চারিদিকে অনন্ত অন্ধকার; আলোকের রেশটুকু মাত্রও আর কোথাও অবশিষ্ট নেই। এই নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকারের চাপে যেন তার দম বন্ধ হয়ে এল; সে আকুলকণ্ঠে বলে উঠল—"এই যতীনদাই যে আমাকে সামশুলকে মারতে পাঠিয়েছিলেন।"

ঝানু পুলিস অফিসার দুঃখিত কণ্ঠে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন, "তা তো পাঠাবেনই। তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছেন। সামশুল সাহেব ছিলেন তাঁদের দলের যম, আর আপনাকে তাঁরা মনে করেন বিশ্বাসঘাতক—তাই তিনি বুদ্ধিমান লোকের মত আপনাকে দিয়েই তাঁকেও শেষ করালেন, আর আপনাকেও শেষ করলেন।"

পুলিস দরদভরা কণ্ঠে বীরেনকে বোঝাতে লাগল—"আপনি এক কাজ করুন; যতীন মুখুজ্যে যে আপনাকে সামশুল সাহেবকে মারতে পাঠিয়েছিলেন আপনি জজের কাছে এই জবানবন্দী দিন, আর লাট সাহেবের কাছে আপনার জীবন-ভিক্ষার দরখাস্ত দিন, গভর্ণমেণ্ট আপনাকে জীবন-ভিক্ষা দিয়ে খালাস দিয়ে দেবে।"

বীরেন তখন পাহাড় থেকে নিচে খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। সে জবানবন্দীতে বললে যে, যতীন্দ্রনাথই তাকে সামশুলকে মারতে আদেশ করেছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা আনলেন। বীরেনের সাক্ষ্যেই যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ হোল। এইবার বীরেনকে দিয়ে যতীন্দ্রনাথকে সনাক্ত (Identification) করালেই প্রমাণ পাকা হয়। এর কিছু পূর্বেই যতীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি হাওড়া জেলে বন্দী ছিলেন—পুলিস তাঁকে হাওড়া জেল থেকে ট্রান্সফার করে প্রেসিডেন্সী জেলে (বীরেন এখানেই ছিল) নিয়ে এল।

যতীন্দ্রনাথ আগেই শুনেছিলেন যে, বীরেনের সাক্ষ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে সামশুলের হত্যার চার্জে মামলা হচ্ছে। তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্য ব্যারিস্টারও দেওয়া হয়েছিল। বীরেনের ফাঁসির জন্য যে দিনটি ধার্য ছিল, ঠিক তার আগের দিনটিতে যতীন্দ্রনাথকে প্রেসিডেন্সি জেলে বীরেনকে দিয়ে সনাক্ত করবার ব্যবস্থা হোল।

বীরেন জানত যে যতীন্দ্রনাথকে সনাক্ত করলে ফাঁসি তার হবে না—সে প্রাণভিক্ষা পাবে। বিচারে যতীন্দ্রনাথের অবশ্য ফাঁসি হবে।

জেলখানার মধ্যে বীরেন যতীন্দ্রনাথকে সনাক্ত করল। তার বুকের মধ্যে তখন ক্রোধ, অভিমান ও প্রতিশোধ-স্পৃহার আগ্নেয়-গিরি ফেটে পড়ছে।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুরু-শিষ্যে ফের দেখা হোল। যতীন্দ্রনাথ নির্ভীক অকুণ্ঠ প্রসন্ন ভঙ্গীতে যতীন্দ্রনাথের মতই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দুই চোখ দিয়ে করুণার শত প্রস্রবণ যেন বীরেনের সর্বাঙ্গে এসে সিঞ্চিত হতে লাগল। সেই সিঞ্চণে বীরেনের মনের সব জ্বালা সব অশান্তি দেখতে দেখতে ধুয়ে শীতল হয়ে গেল! তার মনে হোল দাদার ঐযে গভীর স্নেহকোমল নয়ন, সেখানে ঘৃণা বিদ্বেষ কৈ? গভীর অনন্ত স্নেহ আর মমতাই ত সেখানে টলমল করছে। ঐযে তাঁর প্রশান্ত করুণাঘন সমাহিত ভঙ্গী, তাঁর বলিষ্ঠ ঋজু দেহের সর্বাঙ্গ ব্যেপে আছে, সেখানে ত একটিও অবিশ্বাসের কুঞ্চনরেখা সে দেখতে পেল না।

এইবার যতীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে বীরেনকে জেরা করবার পালা। কিন্তু পরদিন ভোরবেলাতেই বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেল, যতীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে তাকে জেরা করার সময় পাওয়া গেল না।

পুলিসের কাজ হয়ে গেছে, তারা বীরেনকে তার সেল-এ নিয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথ একান্ত নিরভিমান প্রসন্ন মনে প্রশান্তভাবে—সক্রেটিস যেমন করে বিষপান করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম যেমন করে রথের 'পরে নিশ্চেষ্ট বসে শিখণ্ডীশোভিত রথ থেকে অর্জুনের ধনুকের রাশি রাশি মৃত্যুবাণ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি করে বীরেনের জবানবন্দী ও সনাক্ত-করণের মৃত্যুবাণ গ্রহণ করলেন।

এইবারে বীরেনের চোখের ওপর থেকে বিভ্রান্তির কালো পর্দা অপসৃত হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল পুলিস তাকে কি ফাঁদে ফেলেছে। তার মন অনুশোচনায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

প্রাণভিক্ষার মার্জনা এল না। পরের দিন সকালে তার ফাঁসি অবধারিত। কিন্তু তাতে একবিন্দুও দুঃখ নেই আর বীরেনের মনে। জীবন তার সার্থকতায় ভরে গেছে। বিপ্লবীর কর্তব্য সে পালন করেছে। নেতার নির্দেশে সে অসাধ্যসাধন করেছে। কাল প্রভাতের প্রথম অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ফাঁসির মঞ্চে উঠে পূর্ণাহুতি দিয়ে বিপ্লব-ব্রতের উদ্‌যাপন করবে। তার জীবনের ধ্রুবতারা, তার নেতা যতীনদার অজস্র আশীর্বাদ অনন্ত ভালবাসা তাকে কোলে করে ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছে দেবে। জীবন তার পরিপূর্ণ, সার্থক। আলো, আলো, কেবল আলো—সমস্ত অন্তর তার জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে।

পরদিন প্রভাত।

একটি নির্জন সেল-এ বিনিদ্র রজনী যাপন করে যতীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন, বুক তাঁর ব্যথায় মুচড়ে যাচ্ছে ; দুই চোখ দিয়ে তাঁর শত মুক্তাবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর প্রাণাধিক কিশোর বীর ঐ চলেছে বধ্যভূমিতে।

সারা রজনীর পরিতৃপ্ত নিদ্রার পরে স্নান সেরে ভগবানের নাম গ্রহণ করে প্রসন্ন চিত্তে দাদার স্নেহ-দীপ্ত ক্ষমাসুন্দর মুখখানি স্মরণ করতে করতে অবিকম্পিত দৃঢ় পদক্ষেপে বীরেন চলেছে ফাঁসির মঞ্চে। কঠিনতম কর্তব্য সে পালন করেছে, দাদার অফুরন্ত স্নেহে সে অভিষিক্ত হয়েছে। একদিন এই দেশ, তার জননী জন্মভূমি স্বাধীনতা পাবে, তাদের এই প্রাণদান ব্যর্থ হবে না।

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে'
বলতে বলতে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে সে বলে উঠলো, "বন্দেমাতরম্" !

দুই বাহু শূন্যে প্রসারিত করে দিয়ে আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে বুকের উপর চেপে ধরে যতীন্দ্রনাথ কেঁদে উঠলেন "বীরেন !"

আদালতে যখন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হত্যার মামলার শুনানী হয়, তখন Law of Evidence অনুসারে বীরেনকে জেরা করা হয়নি বলে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে গেল এবং এই আইনের ফাঁকে যতীন্দ্রনাথ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন।

বীরেনের সাক্ষ্যে নিজের ফাঁসি হতে পারত, তা সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথ তার অপরাধ বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করেননি। মন্ত্রগুপ্তি প্রকাশ কোন অবস্থাতেই বিপ্লবীর করণীয় নয়—সেই দোষে বীরেনের প্রতি বিপ্লবী-দলের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বীরেনের মতন ছেলেমানুষ ভুল বোঝার জন্যে যা করে ফেলেছে, তার জন্যে তাকে সম্পূর্ণ মার্জনা করেছিলেন—পরন্তু তার সাহস, ত্যাগ, দেশপ্রেম ও চরম আত্মোৎসর্গের জন্য তাকে প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন। পরবর্তী কালেও তিনি বীরেনের জন্য অশ্রুমোচন করতেন ; তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে সহ্য করতে পারতেন না। একবার যতীন্দ্রনাথের আর এক পরম স্নেহভাজন বিপ্লবী শিষ্য সুরেশ মজুমদার (পরবর্তী কালে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা) যতীন্দ্রনাথের কাছে বীরেনকে 'বিশ্বাসভঙ্গকারী' বলেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠে সুরেশচন্দ্রকে কঠোর তিরস্কার করে বলেছিলেন, "কক্ষনো বীরেনের নিন্দা করবি না, ছেলেমানুষ পুলিশের সঙ্গে কূট-

বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে এইমাত্র; কিন্তু তার সাহস আর দেশভক্তি কত বড় সেইটে ভেবে দেখ্।" বীরেনকে তিনি সত্যিই প্রাণাধিক ভালবাসতেন। বীরেনের স্মৃতিকে নিজের অন্তরে তিনি অক্ষয় করে রেখেছিলেন, নিজের বংশেও সেই স্মৃতিকে জাগরূক করে রাখার জন্যে তিনি পরে নিজের ছোট ছেলের নাম রেখেছিলেন 'বীরেন্দ্রনাথ'। সামশুল আলমের হত্যার পরে পুলিস যতীন্দ্রনাথ, নরেন ভট্টাচার্য ও আরো প্রায় পঞ্চাশ জনকে গ্রেপ্তার করে। যতীন্দ্রনাথের ছোট মামা ললিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর মুহুরী শ্রীনিবারণ মজুমদারও গ্রেপ্তার হন। এই নিবারণ মজুমদার যতীন্দ্রনাথের জন্মভূমি কয়া গ্রামেরই লোক। গ্রেপ্তার করে পুলিস যতীন্দ্রনাথকে লালবাজার লক-আপে অভুক্ত অবস্থায় রাখে এবং তাঁকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নানাপ্রকার হুমকি ও প্রলোভন দেখায়। যতীন্দ্রনাথ নির্বাক হয়ে রইলেন। পুলিস যখন তাঁকে কোনরকমে কথা বলাতে পারল না, তখন চারদিন অনাহারের পরে তাঁকে পুলিসের বড় কর্তার কাছে অফিসে নিয়ে এল। সেখানে একখানা টেবিলের পাশে বড় বড় কর্তারা চেয়ারে বসেছিলেন। যতীন্দ্রনাথকে সেইখানে এনে বসান হোল। এখানেও পুলিসের বড়কর্তারা তাঁকে স্বীকারোক্তি করাবার জন্য পালাক্রমে ভয় ও প্রলোভন দেখাতে লাগলেন। যতীন্দ্রনাথ নির্বাক বসে রইলেন। তখন একজন ইংরেজ পুলিস অফিসার মন্তব্য করে উঠলেন, "He should be given glasses and lasses for making his confession" ("স্বীকারোক্তি করাবার জন্য ওঁকে সুরা এবং তরুণী নারী দিতে হবে।" সাহেব এই কথা বলবামাত্র যতীন্দ্রনাথ তীরবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চীৎকার করে উঠলেন—Shut up you nonsence! ক্রোধে আত্মহারা হয়ে মুষ্টি উদ্যত করতেই সাহেব একলম্ফে পালিয়ে গেলেন,

যতীন্দ্রনাথ, ইন্দুবালা, (সহধর্ম্মিনী) জ্যেষ্ঠপুত্র তেজেন্দ্রনাথ,
জ্যেষ্ঠাকন্যা আশালতা ও জ্যেষ্ঠাভগিনী বিনোদবালা

হাতের কাছে সাহেবকে না পেয়ে যতীন্দ্রনাথ দারুণ ক্রোধে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করলেন টেবিলের উপরে, প্রচণ্ড সেই ঘুঁষির আঘাতে টেবিলের উপরকার তক্তাটা গেল ফেটে। চারদিনের অনাহারী লোকের মুষ্ট্যাঘাতের প্রচণ্ড শক্তি দেখে সাহেবরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে লক-আপে পাঠিয়ে দিলেন। লক-আপ থেকে তাঁকে হাওড়া জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোল।

যতীন্দ্রনাথ, নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) ও আরো জনা পশ্চাশেক যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, এঁদের সবাইকে আসামী করে গভর্ণমেণ্ট 'হাওড়া ষড়যন্ত্র' মকদ্দমা শুরু করলেন। এক বৎসর এই মামলা চলেছিল। প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স এই মামলার বিচার করেছিলেন—বিচারে অভিযুক্তগণ সকলেই নির্দোষী বলে গণ্য হন এবং ছাড়া পান। যতীন্দ্রনাথ ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তিলাভ করেন। এই ষড়যন্ত্রের মামলাতে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি জাঠ-সৈন্যবাহিনীর (10th Jat regiment) সঙ্গে বৈপ্লবিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং ঐ সৈন্য-বাহিনীকে বিদ্রোহ (mutiny) করবার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বিচারে প্রমাণাভাবে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট নিঃশঙ্ক হতে পারলেন না। তাঁরা দশম জাঠ-সৈন্যবাহিনী (10th Jat regiment) ভেঙে দিলেন।

১৯১০ সালে ঢাকাতেও খুব ধরপাকড় গ্রেপ্তারের হিড়িক লেগে গেল। অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাসকে ও বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করে গভর্ণমেণ্ট 'ঢাকা ষড়যন্ত্র' মামলা শুরু করলেন। এই মামলাতে পুলিনবাবুর সাত বছরের দ্বীপান্তর হয় ও অন্যান্য অনেকের কঠোর কারাদণ্ড হয়।

এই সময়ে মেদিনীপুরে 'মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের হয়,

যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষকুমার দাস ও সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর নামে। তাঁদের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন সাহেবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। প্রথমে মেদিনীপুরে আসামীদের দশ বৎসর করে দ্বীপান্তরের আদেশ হয়; পরে হাইকোর্টে আপীল করে তাঁরা তিনজনেই মুক্তি লাভ করেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিপ্লবীদল বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে বোমা ফেলবার পরে তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এই কার্যকে সমর্থন করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা করেন ও তিলক মহারাজের ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও Externment (দেশান্তরিত করা) হুকুম হয়। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে ব্রহ্ম দেশের মান্দালয় জেলে প্রেরণ করেন। বাঙলা দেশে শ্রীঅরবিন্দের যেরূপ প্রভাব ছিল, মহারাষ্ট্রে তিলক মহারাজের সেইরূপ প্রভাব ছিল। তিলকের সমর্থনে ও কারাদণ্ডে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও তাঁর দাদা গণেশ সাভারকর—এঁরা দুজনে ছিলেন মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী নেতা। বিনায়ক সাভারকর ১৯০৬ সালে ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য বিলাতে যান ও ইয়োরোপে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবীদল গড়ে তোলার কাজে লেগে যান। এখানে তিনি গুজরাটের শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হন। এঁরাও ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়েছিলেন এবং এঁরাও বিপ্লবী হন। পরে বৈপ্লবিক কার্যের অপরাধে গভর্ণমেণ্ট এঁদের তিন জনেরই ব্যারিস্টারীর অধিকার বাজেয়াপ্ত করে নেন। ১৯০৯ সালে গণেশ সাভারকর রাজদ্রোহমূলক এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করবার জন্য দেশবাসীকে 'তলোয়ার ধারণ'

করতে আহ্বান করেন। তাঁর নামে রাজদ্রোহের মামলা হয় ও তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়। বিলাতে এই সংবাদ পেয়ে বিনায়ক সাভারকর খুব বিচলিত হন।

গণেশ সাভারকরের দ্বীপান্তর দণ্ড হবার তিন সপ্তাহ পরে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের এক সভায় সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার (ভারত সচিব) সহায়ক স্যার কার্জন ওয়াইলিকে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও বিনায়ক সাভারকরের সহকর্মী মদনলাল ধিংড়া নামক এক তরুণ পাঞ্জাবী বিপ্লবী গুলি করে হত্যা করেন। বিচারক ধিংড়াকে প্রাণদণ্ড দিলে সে উৎসাহভরে বিচারককে সম্বোধন করে বলে উঠল, "Thank you my Lord, I am glad to have the honour of dying for my country." "আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যে আমাকে আমার দেশের জন্য মৃত্যু বরণের সৌভাগ্য-অর্জনের সুযোগ দিলেন তার জন্যে আমি খুবই আনন্দ লাভ করলাম।" প্যারিস থেকে কুড়িটা পিস্তল বিনায়ক দামোদর বোম্বাইতে পাঠিয়ে দেন। ঐ পিস্তলের একটি দিয়ে জ্যাকসন সাহেবকে একটি সম্বর্ধনা সভাতে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই খুনের অপরাধে সাত জনের বিচার হয়। অনন্ত কানাইয়ে, বিনায়ক দেশপাণ্ডে ও কৃষ্ণজি কার্ভে এই তিন জনের ফাঁসি হয় ও অপর তিন জনের দ্বীপান্তর হয়। ঐ মামলাতে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকেও হত্যার সাহায্যকারী বলে আসামী করা হয় এবং তাঁকে বিলাতে গ্রেপ্তার করে ১৯১০ সালের মার্চ মাসে ভারতাভিমুখে চালান করা হয়। পথে মার্সাই বন্দরের কাছে তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাঁতার দিয়ে ডাঙ্গায় এসে ওঠেন। এখানে আবার তাঁকে ফরাসী পুলিস গ্রেপ্তার করে ইংরেজ পুলিসের কাছে সমর্পণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে 'নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা'য় স্পেশাল

ট্রাইবুন্যালের বিচারে সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এই মামলাতে আটত্রিশ জন আসামী ছিলেন, তার মধ্যে সাত জনের শাস্তি হয়েছিল।

এই বছরে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উপরে আমেদাবাদে বোমা ফেলা হয় কিন্তু বড়লাট আহত হননি। ১৯১০ সালে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার এক সহকর্মী ভি. ভি. এস. আয়ার ভারতে আসেন এবং পণ্ডিচেরিতে বিপ্লবী যুবকদের রিভলভার ছোঁড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ত্রিবাঙ্কুরের বন-বিভাগের কর্মচারী বাঞ্চি আপর ১৯১১ সালে পণ্ডিচেরী আসেন এবং আয়ারের সঙ্গে পরিচিত হন। আয়ারের কাছে তিনি রিভলবার ছোঁড়া শিক্ষা করে ১৭ই জুন তারিখে ট্রেনে ম্যাজিস্ট্রেট 'অ্যাশ'-কে গুলি করে হত্যা করেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করে বাঞ্চি নিজে আত্মহত্যা করেন। বাঞ্চি আত্মহত্যা করার আগে এক টুকরো কাগজে নিজ কর্তব্য পালন করেছেন—এই কথা লিখে পকেটে রেখে যান।

বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ (সে সময়ে সংযুক্ত প্রদেশ), পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশেও বিপ্লব আন্দোলন ও বিপ্লবীদল বেশ বিস্তারলাভ করেছিল। উত্তর প্রদেশে আর একজন শক্তিমান ও প্রতিভাশালী বিপ্লবী নেতা দেখা দিলেন। ইনি শ্রীরাসবিহারী বসু। রাসবিহারী বসুর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। তাঁর জন্মস্থানও সুবলদহ, মতান্তরে তাঁর মাতুলালয় হুগলী জেলার পালাড়া গ্রামে। যাই হোক রাসবিহারী ছিলেন বলিষ্ঠদেহ, সাহসী, তেজস্বী মানুষ। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল জ্বলন্ত। তাঁর সংগঠনশক্তিও ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও গভীর চিন্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। এ হেন ব্যক্তি সে যুগে বিপ্লবী দলে না এসে পারেন না। ১৯০৮ সালে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে

একটি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খোলেন। বাঙলায় তখন স্বদেশী আন্দোলনের ভরা জোয়ার। অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ হস্ত; পরে তিনি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হন। যুগান্তর দলের উপেন্দ্রনাথ ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলালের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ একসঙ্গে ডাফ কলেজে বি-এ পড়েন। বারীন্দ্রকুমারের তিনি ছিলেন প্রাণের বন্ধু। বস্তুতঃ বারীন্দ্র অমরেন্দ্র উপেন্দ্র ও হৃষিকেশ ছিলেন একমন একপ্রাণ। অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ উন্নতমনা সাত্তিক প্রকৃতির মানুষ, সাহসী ত্যাগী দেশগতপ্রাণ বিপ্লবী। অমরেন্দ্রনাথের 'শ্রমজীবী সমবায়' বাহিরে ছিল স্বদেশী ভাণ্ডার, কিন্তু ভিতরে ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের ঘাঁটি। এই দোকানের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন বাঘা যতীন, অমরেন্দ্রনাথ, চন্দননগরের বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষ, মতিলাল রায়, কলকাতার বিপিন গাঙ্গুলী ও ২৪-পরগণার নরেন ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি। শ্রমজীবী সমবায়ের বিপ্লবী ঘাঁটির সঙ্গে রাসবিহারীর যোগাযোগ ছিল। মানিকতলার বাগানের ঘাঁটির সঙ্গে এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। রাসবিহারী ডেরাডুনে মিলিটারি একাউণ্টসে চাকরি করতেন। তিনি চন্দননগরের বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর চন্দননগরে যাওয়া-আসাও ছিল এবং তার ফলে চন্দননগরের বিপ্লবী মতিলাল রায়ের সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয় ও যোগাযোগ হয়।

'হাওড়া ষড়যন্ত্র' মামলা থেকে 'অব্যাহতি লাভ করে জেল থেকে বেরিয়ে এসে যতীন্দ্রনাথ নূতন করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। এই মামলার ফলে তিনি বাঙলা গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের অধীনে যে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করতেন, সে চাকরি যায়। যতীন্দ্রনাথ নদীয়া যশোহর খুলনা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি

জেলাবোর্ডের ঠিকেদারী কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি এসময়ে যশোহর জেলার ঝিনেদাতে বাসা করেন। ঝিনেদার বাসাতেই তিনি সপরিবারে বাস করতেন। তাঁর পরিবারে তখন তাঁর দিদি, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে ও দুই ছেলে। এই ঝিনেদার বাসাই ছিল তাঁর ঠিকেদারী ব্যবসায়ের হেড কোয়ার্টার। কিন্তু ব্যবসা ত নয়—ব্যবসায়ের অন্তরালে বিপ্লবী দল সংগঠন করাই আসল কাজ।

যতীন্দ্রনাথ ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করলেন। এতদিন পর্যন্ত বিপ্লবীদলগুলি পরস্পর সম্মিলিত হতে পারেনি। বিভিন্ন দল বিভিন্ন নেতা বা নেতৃমণ্ডলীর পরিচালনায় কাজ ক'রত; সকলে সম্মিলিত হয়ে একটি বড় পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামেনি, পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি প্রোগ্রাম অথবা একটি প্ল্যান নিয়ে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যায়নি। যতীন্দ্রনাথ সকল বিপ্লবী-দলকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতের সমগ্র বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করে চূড়ান্ত আক্রমণের দ্বারা ভারতে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করে ভারতের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হলেন। এর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন দলগুলির লক্ষ্য ছিল লাট বেলাট ও উচ্চ সরকারী কর্মচারী হত্যা করে গভর্ণমেণ্টের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করা, যাতে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার দমন হয় ও বিলাতের গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে উন্নত ধরণের শাসন-সংস্কার প্রদান করে। বিপ্লবীদলগুলি মনে ক'রত এইরূপ ত্রাসের সৃষ্টি করলে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট শাসন-সংস্কার দেবে। সেই শাসন-সংস্কার গ্রহণ করার লোকের অভাব দেশে হবে না। কিন্তু বিপ্লবীরা শাসন সংস্কার গ্রহণ করবে না—তারা ক্রমাগত গভর্ণমেণ্টকে আঘাত হেনে যাবে। দেশে একটা শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হলে দেশের একদল নেতা তা গ্রহণ করবে, ফলে দেশ কিছুটা অগ্রসর হবে। কিন্তু বিপ্লবীরা আবার আঘাত হানতে

থাকবে—গভর্ণমেণ্ট বিব্রত ও শঙ্কিত হয়ে আবার উন্নততর শাসন-সংস্কার দেবে, কিন্তু বিপ্লবীরা আরো আঘাত হেনে যাবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেশের লোকের হাতে ক্রমশ ক্রমশ অধিক হতে অধিকতর শাসন ক্ষমতা চলে আসবে। এইভাবে এগুতে এগুতে দেশ একদিন স্বাধীন হবে। বিপ্লবী দলগুলির এইরূপ মনোভাব ও কর্মপদ্ধতির জন্যেই বিপ্লবীদের কল্পনায় (Imagination) যাই থাক না কেন, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনকে নাম দিয়েছিল 'Terrorism' বা সন্ত্রাসবাদ।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এই কল্পনার আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন। তাঁর ধ্যানে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র। তাই তিনি ভারতের সকল বিপ্লবী দলকে প্রথমতঃ ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়াস পেলেন এবং সেই ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় সর্বভারতীয় অভ্যুত্থানের দ্বারা ভারতবর্ষে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গঠন করবার ও স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

সে যুগে সকল বিপ্লবীদলকে ঐক্যবদ্ধ করা যে কত বড় কঠিন কাজ ছিল তা আজকের দিনে উপলব্ধি করা খুবই শক্ত। গুপ্ত সমিতিগুলির কর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ দলের নেতাকেই মনে করতেন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা—আবার দলীয় নেতাদেরও মনে মনে যথেষ্ট অহমিকা ছিল, যার ফলে প্রত্যেক দলের মধ্যেই যেন একটা সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল। বিশেষতঃ তখন সব বিপ্লবী দলের দৃষ্টিভঙ্গীও এক ছিল না। আদর্শ কর্মপদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও সকল দলের মিলনের একটা প্রবল অন্তরায় ছিল।

কিন্তু এই অসাধ্য সাধন সেদিন করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা, অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, অসীম শারীরিক,

মানসিক ও চরিত্রবল, জ্বলন্ত দেশপ্রেম প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এবং তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী দেখে বিমুগ্ধ হয়ে একে একে ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী দল ও বিপ্লবী নেতা তাঁকে নেতা বলে মেনে নিয়ে তাঁর পাশে এসে জড়ো হতে লাগলেন। আজ ভাবতে বিস্ময় লাগে সেদিনের সব বিপ্লবী নেতা, যাঁরা নিজেরাই এক একজন দিকপাল বিশেষ—অতুলনীয় সংগঠন-কুশলী রাসবিহারী বসু, অদ্বিতীয় মনীষী নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), নির্ভীকতা ও পরাক্রমে অপরাজেয় বিপিন গাঙ্গুলী, ক্ষুরধার-বুদ্ধি গভীর চিন্তাশীল ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অকুতোভয় দুর্ধর্ষ বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস, বিরাট ব্যক্তিত্ব-শালী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এইরূপ ভারতের সর্বস্থানের শত শত বিপ্লবী নেতা যাঁকে সর্বান্তঃকরণে নেতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, কত বড় অচিন্তনীয় শক্তি, প্রতিভা ও দেশপ্রেমের বিগ্রহ ছিলেন সেই যতীন্দ্রনাথ।

বিপ্লবী নেতারা এ সময়ে যতীন্দ্রনাথকে কে কিভাবে দেখেছিলেন সেকথা অনেকে বলেছেন ও লিখেছেন। বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"যতীনের মতন বীর ও দেশভক্ত এ যুগে ভারতবর্ষে দেখিনি। যোদ্ধা ও রণনেতা হিসাবে একমাত্র নেপোলিয়নের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। স্বাধীন দেশে জন্মালে যতীন পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকত।" বিপ্লবী নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "তিনি ছিলেন আমার শূর-বীর"। ডাঃ যাদুগোপাল 'শূর-বীর' কথাটি সম্ভবতঃ ইংরাজী 'হিরো' (Hero) কথাটির অর্থে ব্যবহার করেছেন। যতীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের জীবনের আদর্শের মূর্ত বিগ্রহকে দেখেছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী এবং যতীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য অতুল ঘোষ মহাশয় বলেছেন, "শিবাজীর সাহস ও গৌরাঙ্গদেবের প্রেম একত্র করলে যে ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই রকম একজন মানুষ।"

ভারতের বিপ্লবী নেতারা সেদিন যতীন্দ্রনাথকে এইরূপ ভাবে দেখেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন। সেদিনের বিপ্লবীরা ছিলেন সর্বত্যাগী, অসমসাহসী বীর দেশপ্রেমিক। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র স্বদেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই তাঁদের কাম্য ছিল না, আর সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে নিজের প্রাণ বলি দেওয়া ছাড়া জীবনের আর কোন সার্থকতার কল্পনাও তাঁদের মনে ছিল না। এই বিপ্লবীদের মধ্যে সাহস, বীরত্বও নির্ভীকতা ছিল অচিন্তনীয়। যে সব সাহসের কাজ তাঁরা করেছেন সমস্ত জগতে তার তুলনা পাওয়া যায় না। স্বদেশপ্রেম ছিল তাঁদের অপরিমেয়। এঁদের স্বদেশ-প্রেম যে কত গভীর ছিল তার ধারণা করাও কঠিন। মীরাবাঈয়ের জীবনে তাঁর উপাস্য দেবতা গিরিধারীলালের (শ্রীকৃষ্ণ) প্রতি যে গভীর অপরিমেয় ও তীব্র প্রেম মীরাকে রানীগিরি ত্যাগ করিয়ে যোগিনী করিয়েছিল, যৌবনে বিলাস, ঐশ্বর্য, এমন কি স্বামীকেও ত্যাগ করিয়ে সন্ন্যাসিনী করিয়েছিল, সেইরূপ গভীর অপরিমেয় তীব্র স্বদেশ-প্রেম ছিল এই বিপ্লবীদের মনে। মীরা যেমন গিরিধারীলালের প্রেম-দিওয়ানী (প্রেম-পাগলিনী) হয়ে সর্বত্যাগিনী হয়েছিলেন, এই বিপ্লবীরাও তেমনি স্বদেশপ্রেমে পাগল হয়ে সর্বত্যাগী হয়েছিলেন। প্রাণের সমস্ত অনুরাগকে মন্থন করে অঞ্জলী পুরে এঁরা ঢেলে দিয়েছিলেন স্বদেশ-জননীর চরণে।

মোহিনীদার কথা মনে পড়ছে। মোহিনীমোহন মজুমদার। ইনি ছিলেন বাঘা যতীনের একজন বিপ্লবী শিষ্য। কলকাতার বিখ্যাত পুস্তকালয় ডি. এম. লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী ও প্রকাশক গোপালদাস মজুমদারের আপন কাকা ছিলেন ইনি। মোহিনীদা খুব ভাল গায়ক ছিলেন। আমি কতদিন দেখেছি যখন কোন কাজকর্ম থাকত না, অবসর পেতেন, মোহিনীদা ভাব-মগ্ন হয়ে উদাত্তকণ্ঠে গান করতেন

মরি তাহে ক্ষতি নাই
স্বাধীনতা দেখে যাই।

গান করতে করতে মোহিনীদার দুচোখ দিয়ে মুক্তাবিন্দুর মত টপটপ করে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ত, সর্বশরীরে রোমাঞ্চ হত, আর তাঁর ভাব-সমাধি হয়ে যেত। বিপ্লব আন্দোলনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন মোহিনীদা। জমিদারের ছেলে হয়েও বিষয় ভোগ করেননি, বিয়ে করেননি, সংসার করেননি, সারাজীবন অসীম দুঃখ কষ্ট জেল অন্তরীণ গভর্ণমেণ্টের নির্যাতন অত্যাচারের মধ্যেই তাঁর জীবন কেটে গিয়েছে। আর এই যে অসীম দুঃখ কষ্ট পীড়ন অত্যাচার—যাতে মানুষের মন ভেঙে যায়—তাতেই তিনি পেতেন অসীম আনন্দ।

এ হেন হাজার হাজার বিপ্লবী সেদিন যতীন্দ্রনাথকে আপন আপন আদর্শের মূর্ত প্রতীকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন ; তাই তাঁরা সেদিন তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করলেন।

যতীন্দ্রনাথের নিজ হাতে গড়া বিপ্লবী শিষ্যের সংখ্যা বড় কম ছিল না। অসংখ্য তরুণ যুবা তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে বিপ্লব সাধনায় দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাছাড়া এখন (ইংরাজী ১৯১১ সালের পর থেকে) বাঙলার এবং অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন দল তাঁকে সার্বভৌম নেতা হিসাবে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠতে লাগল।

ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠনের কল্পনা যতীন্দ্রনাথের চিন্তায় পূর্বেই ছিল এবং ইতিপূর্বে তিনি এ বিষয়ে কাজও আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। ১০ নং জাট রেজিমেণ্টের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ব্যাপারটা সন্দেহ করে ঐ জাট রেজিমেণ্ট ভেঙে দেয়। যতীন্দ্রনাথ এখন স্থির করলেন যে, সমস্ত ভারতীয়

সৈন্যদলের সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এবং তাদের মধ্যে বিদ্রোহের মন্ত্র প্রচার করতে হবে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, এক সঙ্গে সিপাহীরা বিদ্রোহ করবে, বিপ্লবীরা রেললাইন উড়িয়ে দিয়ে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে ট্রেন চলাচল ও টেলিগ্রাফ অচল করে দেবে—যাতে গভর্ণমেণ্ট ইংরেজ মিলিটারী বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে না পারে—এবং তখন সিপাহী ও বিপ্লবীদের সঙ্গে ছাত্র যুবা ও জনগণকেও যোগদান করিয়ে এক সমগ্র সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে হবে। এই অভ্যুত্থানের দ্বারা ইংরেজ মিলিটারীকে পর্যুদস্ত করে ফেলা হবে ও স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দিলেন যতীন্দ্রনাথ।

রাসবিহারী বসু এসে যোগদান করলেন বাঘা যতীনের সঙ্গে। রাসবিহারীর যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগদান ভারতের বিপ্লব অন্দোলনে যেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। বিপ্লবী নেতা হিসাবে রাসবিহারীর তুলনা মেলা ভার। এত বড় দেশপ্রেমিক, সংগঠনকুশলী সাহসী ও আত্মত্যাগী মানুষ ইতিহাসে দুর্লভ। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ও রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত তিনি দিয়ে গেছেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য। আর এত বড় আত্মত্যাগীও ইতিহাসে দেখা যায় না। অপরিমেয় শক্তিমান নেতা হয়েও নেতৃত্বের পদ ও অধিকার তিনি যে ভাবে ত্যাগ করে গেছেন, তারও কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। শেষ জীবনে তাঁর নিজে হাতে গড়া Indian Independence League-এর এবং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতৃত্বের পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে আপন নেতৃত্বের মুকুট তিনি নিজে হাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাথায় পরিয়ে দিয়ে নেতাজীকে সর্বাধিনায়কের পদে বরণ ও অভিষেক করেছিলেন। তাঁর মহিমা অতুলনীয়।

যতীন্দ্রনাথ রাসবিহারী ও অমরেন্দ্রনাথকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর

কালীবাড়ির পঞ্চবটীতলায় গোপন আলোচনা করলেন এবং তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন। সকলেই একমত হলেন। যতীন্দ্রনাথ রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পারবে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে নিতে?' রাসবিহারী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন 'হাঁ, পারব।'

রাসবিহারী মীরাট পাঞ্জাব জব্বলপুর প্রভৃতি বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহীদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। বাঙলায় সৈন্যদলের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ নিজে কাজ করতে ও যোগাযোগ স্থাপন করতে লাগলেন। সর্বত্রই সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন চলতে লাগল এবং অসংখ্য সিপাহী বিপ্লববাদে দীক্ষিত হতে লাগল। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের ভারতীয় সৈন্যরা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে যোগ দেবে ব্যবস্থা হোল।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, বীর সাভারকর, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ইয়োরোপে ভারতীয় বৈপ্লবিক দল সংগঠন করেন। জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের বড় রকমের কেন্দ্র ছিল এবং বার্লিনে তাঁদের ঘাঁটির নাম ছিল 'বার্লিন কমিটি'। বহু ভারতীয় ছাত্র এবং ব্যবসায়ী এই 'বার্লিন কমিটির' সভ্য ছিলেন এবং এঁরা ছিলেন বিপ্লবী। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠান। আবার আমেরিকা ও কানাডায় ভাই পরমানন্দ, হরদয়াল ও বরকতুল্লা প্রভৃতি বিপ্লবীরা গদর পার্টি নামে একটি বিপ্লবী দল সংগঠন করেছিলেন। গদর পার্টির অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন পাঞ্জাবী। ভাই পরমানন্দ ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। পড়াশুনার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিপ্লবী দল সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি লাহোরের ডি. এ. ভি. কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হন। পরে এঁর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল।

যাই হোক, এঁদের চেষ্টাতে আমেরিকায় 'গদর দল' গড়ে ওঠে। গদর মানে বিপ্লব। ১৯১৩ সালে সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে নভেম্বর মাসে দলের মুখপত্র 'গদর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকা বিপ্লববাদ প্রচার করতে থাকে এবং তাতে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা আনতে হবে এবং তার জন্যে হাজার হাজার বীর যোদ্ধা চাই—এই আবেদন জানাতে থাকে। আমেরিকাতে পাঞ্জাবীদের মধ্যে প্রকৃতই গদর পার্টির হাজার হাজার বিপ্লবী সভ্য সংগৃহীত হয়েছিল।

গদর পত্রিকা শুধু আমেরিকাতেই প্রচারিত হত না, অন্যান্য দেশেও, যেখানে বহুসংখ্যক ভারতীয় ছিল, সে-সব দেশেও ঐ পত্রিকা প্রচারিত হত। বর্মাতে বহু ভারতীয় বাস করতেন—এখানে হিন্দী, মারাঠী, উর্দু, গুজরাটি, গুরমুখী প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরাজীতে ছাপান গদর পত্রিকা পাঠান হত। ব্যাঙ্ককেও গদর পত্রিকা প্রচারিত হত। এর ফলে দূর প্রাচ্যে বিপ্লববাদের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন, সেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য কাজ করার ও প্রাণ বিসর্জন দেবার প্রেরণায় হাজার হাজার ভারতীয় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। শ্যাম দেশে, বর্মায়, মালয়ে ভারতীয় বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল এবং সিঙ্গাপুর, বাটাভিয়া, ব্যাঙ্কক, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী ঘাঁটি সংগঠিত হয়েছিল। এই সকল বিপ্লবী ঘাঁটিতে বহু সংখ্যক পাঞ্জাবী যোগদান করেছিলেন, কিছু সংখ্যক মুসলমানও এই সব বিপ্লবী দলে ছিলেন। সিঙ্গাপুরের সিপাহীদের মধ্যেও বিপ্লবের বাণী প্রচার হয়েছিল এবং তারাও বিদ্রোহ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। গভর্ণমেণ্ট কিছু কিছু সংবাদ পেয়ে সৈন্যদলের হাবভাবের উপরে কড়া দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করেন এবং সিঙ্গাপুরের 'মালয়া স্টেট

গাইডার' নামক সৈন্যদলের উপরে সন্দেহ করে সিঙ্গাপুর থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে দেন।

"কিন্তু সিঙ্গাপুরের অপর সেনাদলটি (ফিফ্‌থ ইনফ্যান্ট্রি) আমেরিকার গদর দলের হিন্দু ও মুসলমান কর্মীদের প্রভাবে এসে সত্যই বিদ্রোহ করে। সাতদিন তারা সিঙ্গাপুরকে নিজেদের অধিকারে রাখেন। তখন ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ চলেছিল।'

আমেরিকা থেকে গদর দলের লোক অনবরতই সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, বাটাভিয়া প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করতে লাগল এবং সিপাহী ফৌজদের মধ্যে খুব জোর প্রচার কাজ চালাতে লাগল। বিপ্লবী প্রচারকরা সিপাহীদের বোঝাত—"দেশের জন্য প্রাণ দাও, দেশকে স্বাধীন কর, তোমার স্বদেশ থেকে বিধর্মীর রাজত্ব শেষ করো—বীরের ধর্ম পালন করো—স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দাও।"

সিপাহীদের মধ্যে এইরূপ প্রচার কাজ চালাবার সময়ে ধরা পড়ে গদর দলের কর্মী মোহনলাল পাঠক প্রভৃতি ৪।৫ জন পাঞ্জাবীর ফাঁসি হয় এবং অনেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

বাঙলা দেশ থেকে বিপ্লবী ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় (ইনি বিখ্যাত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ও যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দাদা) বর্মাতে গিয়ে কাজ করছিলেন। ইনি গোপনে অস্ত্র যোগাড় করা এবং বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে গদর দলের সঙ্গে জার্মানদের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল*।

"জার্মানরা 'গদর' দলের সহযোগে যে কাজ করতে চেয়েছিল তা অতি ভয়ানক। আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখরা শ্যামে রেলের কোন স্থানে অস্ত্র-শস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বর্মা আক্রমণ করবে। সেই সময় সৈন্য

* বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

ও মিলিটারী পুলিসও বিদ্রোহ করবে। শ্যাম-বর্মার সীমান্ত-রেলে জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ও পাঞ্জাবী শ্রমিকরা কাজ করছিল। বর্মা থেকে ভারত আক্রমণের কথাও ছিল।"

ভারতে সিপাহীদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার কাজ চালাবার ও বৈপ্লবিক সংগঠন প্রসারিত করবার প্রসঙ্গে স্বর্গত শচীন সান্যালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে এঁদের বাড়ি কিন্তু থাকতেন কাশীতে। দেশের চতুর্দিকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও ঘটনা দেখে শুনে এই তেজস্বী যুবকের মন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। অচিরেই ইনি বিপ্লবী দলে এসে ভিড়লেন এবং সাহস, কর্মকুশলতা ও সংগঠন শক্তির দ্বারা আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেন। রাসবিহারী বসুকে ইনি নেতারূপে বরণ করেছিলেন এবং রাসবিহারীও এঁকে সর্বাধিক স্নেহভাজন শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি কাশীতে একটি ভাল বিপ্লবীদল সংগঠন করেন এবং সৈন্যদলের মধ্যে কাজ করবার ব্যাপারে রাসবিহারীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। সমস্ত উত্তর প্রদেশময় এঁর সংগঠন বিস্তৃত হয়েছিল। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য ছিলেন শচীন সান্যাল। এঁর গুরু রাসবিহারীর মতই ইনিও ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিপ্লবী। ধরা পড়ে ষড়যন্ত্র মামলায় এঁর যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। বছর ৪।৫ আন্দামানে বন্দী থাকার পরে ১৯২০ সালের General Amnesty-তে মুক্তিলাভ করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার পরে ইনি বিবাহ করে সংসারী হন কিন্তু বিপ্লব-ব্রত ত্যাগ করেননি। উত্তর প্রদেশে পুনরায় এক শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন তৈরী করেন এবং এক বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করাতে পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

* বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার বিপ্লবী বীরগণ তাঁরই হাতে গড়া কর্মী। ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনে শচীন সান্যাল একজন একনিষ্ঠ বলিষ্ঠ চরিত্র—তাঁর অবদান এবং স্মৃতি দুইই চিরজীবী।

ভারতের সর্বত্র যখন বৈপ্লবিক সংগঠন খরবেগে প্রসারিত হতে লাগল, সৈন্যদলের মধ্যেও বেশ ভালভাবে কাজ অগ্রসর হতে লাগল, তখন যতীন্দ্রনাথ বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হলেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে ভারতীয় বিপ্লবী দল আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। আর দরকার, সম্ভব হলে কোন বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের সাহায্য যোগাড় করা। যতীন্দ্রনাথের কল্পনায় ভেসে উঠল জার্মানীর সাহায্যের আশা। ইংরেজের শত্রু জার্মানী। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য জার্মানী সম্ভবতঃ সাহায্য করতে পারে। এর ব্যবস্থা করবার জন্যে যতীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হলেন।

১৯১৪ সালে ২৬শে আগষ্ট তারিখে কলকাতার বিলাতী বন্দুক ব্যবসায়ী (Rodda & Co.) রডা কোম্পানীর চার গাড়ি মসার (Mauser) পিস্তল এবং কার্টিজ যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মী ও শিষ্যদের সাহায্যে লুট করালেন। ৫০টি পিস্তল ও ৪৬০০০ রাউণ্ড গুলি তাঁরা লুট করেছিলেন। অস্ত্রগুলি যখন গঙ্গার ঘাটে জাহাজ থেকে নামিয়ে গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে পোর্ট কমিশনারের ঘাট থেকে আসছিল, বিপ্লবীরা সেই সময়ে ঐ গাড়ীগুলি লুঁট করে নিয়ে সরে পড়েন।

রডার মাল লুঠের অসম সাহসিক কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন সাহসে অপরাজেয় বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলী। বিপিন গাঙ্গুলীকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁর মলঙ্গা লেনের অনুকূল মুখার্জী, গিরিণ ব্যানার্জী প্রভৃতি শিষ্যগণ। অস্ত্র সরিয়ে গাব করে রাখার

বন্দোবস্ত করেছিলেন নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। বরিশাল দলের মনোরঞ্জন গুপ্ত, নরেন ঘোষ চৌধুরী প্রভৃতিও এই কাজে সহায়তা করেছিলেন। এই অস্ত্রগুলি পরে যতীন্দ্রনাথ, বিপিন গাঙ্গুলী, সতীশ চক্রবর্তী, মাদারীপুর গ্রুপ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, উত্তর বাঙলা ও চন্দননগর গ্রুপগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

এই কাজে বিপ্লবীদিগকে সাহায্য করেছিলেন যে গাড়িগুলিতে মাল বাহিত হচ্ছিল তারই একটির গাড়োয়ান! এই গাড়োয়ানটিকে অনুকূলবাবু আগে থেকেই যোগাড় করে তৈরি করে রেখেছিলেন। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন কাস্টমসের একজন বাঙালী সরকার, যিনি সেদিন জাহাজ থেকে মাল খালাস করাচ্ছিলেন। এঁকে অনুপ্রাণিত করে তৈরি করে রেখেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। সরকারটি মাল লুঠের পরেই নিরুদ্দেশ হন, তাঁকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগ সারা ভারতবর্ষ এই লোকটিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু বার করতে পারে নি।

যাই হোক রডা কোম্পানীর অস্ত্রগুলি পেয়ে বাঙলার বিপ্লবীদের শক্তি অনেক বেড়ে গেল। তাঁদের অস্ত্রের ক্ষুধা অনেক মিটল। এই অস্ত্রগুলির সাহায্যে তাঁদের পরবর্তী কাজগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্য সত্যেন সেনকে পাঠালেন আমেরিকাতে গদর দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে এবং অপর দুই শিষ্য অবনী মুখার্জ্জী ও নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়)-কে পাঠালেন জাপানে ও বাটাভিয়ায়।

অবনী মুখার্জ্জী জাপানে ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রচার করেন, টোকিওতে বহু বাঙালীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং ভারতীয়

বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁদের সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন কিন্তু কার্যতঃ বিশেষ ফল কিছু হয় না, তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। সত্যেন সেন আমেরিকাতে গিয়ে গদর দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং দেশে ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে গদর দলের কর্মী মহারাষ্ট্রীয় পিংলে ও পাঞ্জাবী কর্তার সিং এবং বহুসংখ্যক পাঞ্জাবী বিপ্লবী আসেন। কর্তার সিং এরোপ্লেন তৈরি শিক্ষা করে এসেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ পিংলে এবং কর্তার সিংকে পাঞ্জাবে এবং উত্তর ভারতে সিপাহীদের মধ্যে কাজ করবার জন্য রাসবিহারীর কাছে পাঠিয়ে দেন।

১৯১৫ সালের প্রথমেই কলকাতায় বাঙলার বিপ্লবী নেতাদের এক বৈঠক হয় এবং এই বৈঠকে যতীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর পরিকল্পনায় ছিল যে ব্যাঙ্কক, পেনাঙ, সাংহাই, বাটাভিয়া, সিঙ্গাপুর, জাভা ও বর্মায় ঘাঁটি তৈরি হবে। এই সব ঘাঁটিগুলি থেকে আমেরিকা ও জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে ও অস্ত্র-শস্ত্র আনা হবে ও ভারতে পাঠান হবে। তার পরে উপযুক্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে ভারতে একসঙ্গে পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত অভ্যুত্থান আরম্ভ করে দেওয়া হবে—দূর প্রাচ্যের এই সব ঘাঁটিগুলি থেকে ভারতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে সাহায্য করা হবে।

যতীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা বিপ্লবী নেতারা অনুমোদন করলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে দরকার প্রচুর টাকার। এত টাকা কি উপায়ে সংগ্রহ হবে? বিপ্লবীরা সকলেই একমত হলেন যে টাকা সংগ্রহ করতে হবে স্বদেশী ডাকাতি করে।

যতীন্দ্রনাথ জলদগম্ভীরস্বরে আজ্ঞা দিলেন, 'এক মাসের মধ্যেই এক লক্ষ টাকা চাই।' সহকর্মী ও শিষ্যগণ সে আজ্ঞা প্রতিপালনের

জন্য প্রস্তুত হলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর নির্দেশে দুটো ডাকাতি হোল। ১২ই জানুয়ারী গার্ডেনরীচে বার্ড কোম্পানীর ১৮ হাজার টাকা লুট হোল ও ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটাতে এক আড়তে ডাকাতি হোল। এই দুই ডাকাতিতে ৪৩ হাজার টাকা সংগ্রহ হোল। এই দুটি ডাকাতিতে বিপিন গাঙ্গুলী ও নরেন ভট্টাচার্য অপূর্ব সাহস, বীরত্ব ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন। গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটার ডাকাতির পরে কলকাতায় পর পর আরো কয়েকটি ডাকাতি হয়।

গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগ খুব সক্রিয় হয়ে উঠল ও বিপ্লবী দলের সংবাদ ও সন্ধান বার করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল। তখন এঁদের কয়েকজনকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার হোল। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে চিত্তপ্রিয় রায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরে ইনস্‌পেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জীকে পিস্তলের গুলিতে নিহত করেন। এর পরে ইনস্‌পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য, গিরীণ চ্যাটার্জী ও গোয়েন্দা নীরদ হালদার বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারায়।

যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী কাশীতে মিলিত হয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত অভ্যুত্থানের দিন স্থির করেন। যতীন্দ্রনাথ বাঙলার এবং রাসবিহারী পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশের বন্দোবস্তের ভার নেন স্থির হয় যে ঐ দিনে রাসবিহারী পাঞ্জাব-মেল আটক করে দেবেন এবং যতীন্দ্রনাথ যদি দেখেন যে পাঞ্জাব মেল কলকাতায় এসে পৌছল না তাহলে তিনি বুঝবেন যে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এবং তিনিও তখন বাঙলাতে কাজ আরম্ভ করে দেবেন।

যতীন্দ্রনাথ তখন বাঙলায় সৈন্যদলের মধ্যে উত্তম সংগঠন তৈরি করে ফেলেছেন। ফোর্ট উইলিয়মে তখন যে ভারতীয় সৈন্য ছিল, তারা বিপ্লবে যোগদান করবে, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে পাঞ্জাবে এক শোচনীয় বিপর্যয় ঘটে গেল। বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃপাল সিং নামক এক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে সব কথা প্রকাশ করে দেয় ও রাসবিহারী, পিংলে ও কর্তার সিংকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। রাসবিহারী ও পিংলে পলায়ন করতে সমর্থ হন কিন্তু কর্তার সিং ধরা পড়ে যায়। অতঃপর 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' তৈরি হয় এবং কর্তার সিং-এর ফাঁসি হয়। তার সঙ্গে আরো বহু সিপাহী ও বিপ্লবীর ফাঁসি ও দ্বীপান্তর হয়।

রাসবিহারী ও পিংলে পাঞ্জাব থেকে কাশীতে চলে এলেন। রাসবিহারী কাশীতে আত্মগোপন করে রইলেন ও পিংলেকে মীরাটে পাঠালেন সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠন করানর জন্য। পিংলে এক বাক্স বোমা নিয়ে মীরাট যান। এই বোমাগুলি সরবরাহ করেছিলেন চন্দননগর গ্রুপ। চন্দননগরের মতিলাল রায়, মনীন্দ্রনাথ নায়েক, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহাদের অন্যান্য সহকর্মীদের সংগঠিত চন্দননগর গ্রুপের সহিত রাসবিহারী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ ও অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ ছিল। মনীন্দ্র নায়েক বোমা তৈরি করতেন। পিংলেকে সরবরাহ করা এই বোমাগুলি অতি মারাত্মক ছিল। পিংলে এই বোমা সঙ্গে নিয়ে মীরাটে গেলেন দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ করাবার জন্যে এবং এই বোমা দিয়ে ইংরেজ গোরাব্যারাক ধ্বংস করার জন্যে। পিংলের নির্দেশে সিপাহীরা বিদ্রোহ করতে সম্মত হয়। পিংলে সিপাহীদের ব্যারাকেই রাত্রে অবস্থান করেন—সকালেই বিদ্রোহ আরম্ভ হবে। কিন্তু রাত্রেই এক ইংরেজ অফিসার পিংলেকে দেখতে পেয়ে সন্দেহ করেন এবং তৎক্ষণাৎ ইংরেজ মিলিটারি দিয়ে ম্যাগাজিন পাহারা দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়। সকালে পিংলে ও দেশী সিপাহীদের গ্রেপ্তার করে ফেলা হল। পিংলেকে ফাঁসি দেওয়া হল। তাঁর সঙ্গের

বোমাগুলি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে বলা হয়েছিল—These bombs were sufficient to anihilate the entire regiment. পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়াতে রাসবিহারী আত্মগোপন করে চন্দননগরে চলে আসেন এবং লুকিয়ে কলকাতা থেকে জাহাজে চেপে P. N. Tagore এই ছদ্মনামে ১২ই মে তারিখে জাপানে চলে যান। শচীন সান্যাল তাঁর 'বন্দীজীবন' গ্রন্থে লিখেছেন যে, রাসবিহারীর জাপানে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুশীলন সমিতি এক হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

এই বিপর্যয়ের পরেও যতীন্দ্রনাথ ভগ্নোৎসাহ বা অবদমিত না হয়ে পূর্ণ তেজে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি নরেন ভট্টাচার্যকে পাঠালেন বাটাভিয়াতে জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে এবং অবনী মুখার্জীকে পুনরায় জাপানে পাঠালেন। অবনী মুখার্জী যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও নির্দেশ নিয়ে 'বিষ্টু এণ্ড কোং' নামক এক ভুয়ো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এজেণ্ট সেজে জাপানে গেলেন। তিনি চীনে গিয়ে ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের সঙ্গেও দেখা করেন। সান-ইয়াৎ সেন তাঁকে ৫০টি পিস্তল, বহু কার্তুজ ও অর্থ সাহায্য দেন। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ ছিল যে সান-ইয়াৎ সেনের সাহায্য নিয়ে তিনি জাপানে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করে ফিরবেন। অবনী মুখার্জী রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করেন, তাঁর কাছ থেকে খবরাখবর এবং অস্ত্র ও অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে আসবার পথে ধরা পড়েন এবং সিঙ্গাপুরে তাঁর ফাঁসি হয়।

নরেন্দ্র ভট্টাচার্য সি. মার্টিন (C. Martin) ছদ্মনামে বাটাভিয়া গেলেন এবং সেখানে জার্মান কনসালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। জার্মান কনসাল নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের মারফত ভারতীয়

বৈপ্লবিক দলের পরিকল্পনা শুনে সাহায্য করতে সম্মত হলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন। তিনি নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে থিয়োডোর হেলফ্রিক নামক এক জার্মানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং এই হেলফ্রিকের মারফত সমস্ত ব্যবস্থা ও কাজকর্ম চলতে লাগল।

নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈদেশিক ব্যাপারের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য কলকাতায় 'হ্যারী এণ্ড সন্‌স' (Harry & Sons) নামে একটি ভুয়ো কোম্পানী হোল। অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি এই 'হ্যারী এণ্ড সন্‌স'-এর কর্ণধার ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ও নরেন ভট্টাচার্যের মাঝখানে যোগসূত্র ছিল এই 'হ্যারী এণ্ড সন্‌স'। বাটাভিয়াতে গিয়ে মার্টিন 'হ্যারী এণ্ড সন্‌স'-এর কাছে ব্যবসা সুবিধাজনক এই মর্মে তার করেন। কোম্পানী মার্টিনের কাছে টাকা চেয়ে পাঠান। মার্টিন ভন হেলফ্রিকের মারফতে হ্যারী এণ্ড সন্‌সকে পর পর কয়েকবার ৪৩ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। বিপ্লবীদের হাতে ৩৩ হাজার টাকা পৌঁছে যাবার পরে পুলিস রহস্য টের পায় ও শেষ কিস্তীর ১০ হাজার টাকা আটক করে।

টাকা পাঠানর পরে নরেন্দ্রনাথ জার্মানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ভারতে বিপ্লবীদলের কাছে প্রচুর অস্ত্র পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। বন্দোবস্ত হয়েছিল যে, তিনটি জাহাজে অস্ত্র ও অর্থ আসবে। একখানা জাহাজে দু হাজার পিস্তল, প্রচুর কার্তুজ, হাতবোমা, বিস্ফোরক দ্রব্য ও দু লাখ টাকা, আর একখানি জাহাজে দশ হাজার রাইফেল, দশ লাখ কার্তুজ, বিস্ফোরক দ্রব্য, হাতবোমা প্রভৃতি প্রেরিত হোল।

পিকিং-এর জার্মান প্রতিনিধি ব্যারণ ভন হিণ্টগু সাংহাইয়ে রাসবিহারী, অবনী মুখার্জী ও ভগবান সিংহের সহিত আলোচনা করে স্থির করেছিলেন যে, জার্মানী ভারতে তিন জাহাজ অস্ত্র পাঠাবে এবং

দশ লক্ষ ডলার অর্থ সাহায্য করবে। এবং এই অস্ত্র ও অর্থাদি নিরাপদে নাবিয়ে নেবার জন্তে ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে প্রথমে কয়েক হাজার রিভলবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জার্মান অস্ত্রবোঝাই জাহাজ 'ম্যাভারিক' ও 'এস হেনরি' অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যাত্রা করেছে ভারতের দিকে—এই সংবাদ এসে পৌছল। যতীন্দ্রনাথ, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল ঘোষ মিলিত হয়ে আলোচনা করে স্থির করলেন কিভাবে কোথায় কোথায় ঐ জাহাজগুলি থেকে অস্ত্র নাবানো হবে? স্থির হলো যে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় কাম্বে উপসাগরের তীরে গোয়ায় একটি জাহাজ থেকে অস্ত্র নাবিয়ে দেবেন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় রায়মঙ্গলে একটি জাহাজ খালাস করবেন এবং যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং বালেশ্বরে আর একটি জাহাজ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করবেন। তার পরে সেই অস্ত্র বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হবে এবং ঐ অস্ত্রের সাহায্যে অভ্যুত্থান আরম্ভ হবে।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় রায়মঙ্গলের এক জমিদারের সাহায্যে জাহাজ থেকে অস্ত্র নাবানর সব বন্দোবস্ত করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভোলানাথ চ্যাটার্জী গোয়াতে গেলেন এবং যতীন্দ্রনাথ গেলেন বালেশ্বরে। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন তাঁর চার জন অনুচর; নীরেন ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত দুই ভাই, চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী ও জ্যোতিষ চন্দ্র পাল।

স্থির হয়েছিল যে প্রথমেই প্রধান সেতুগুলি ধ্বংস করে রেল-পথগুলি অচল করে দেওয়া হবে। যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেলপথ অচল করার ভার নেন। সতীশ চক্রবর্তী অজয় সেতু ধ্বংস করে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথকে অচল করে দেবার ভার নেন। একজন চক্রধরপুর সেতু ধ্বংস করে বেঙ্গল নাগপুর

রেলপথ অচল করার ভার নেন। বিপিন গাঙ্গুলী ও নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কলকাতার দলের উপর ফোর্ট উইলিয়ম দখল করে নেবার ভার ন্যস্ত হয়। নরেন চৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তীকে পাঠান হোল সন্দ্বীপের হাতিয়াতে। সেখানে তাঁরা জলপথে প্রেরিত অস্ত্র ও পূর্ববঙ্গের দলের সাহায্য নিয়ে পূর্ববঙ্গের জেলা-গুলি দখল করে কলকাতার দিকে এগিয়ে আসবেন; এর পরে ভারতের বিভিন্ন কেল্লার দেশীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ করিয়ে সর্বভারতে সর্বাত্মক অভ্যুত্থান করান হবে।

কিন্তু আবার এক বিপর্যয়ে সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেল। শ্যামের উকিল কুমুদনাথ মুখার্জী বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই পরিকল্পনার অনেক কিছুই সে জানত। সে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে সব কথা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রকাশ করে দেয়। আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবার সর্বাবিধ আয়োজন করে ফেললেন।

'এস. এস. ম্যাভারিক' এবং 'এস্ হেনরি' জাহাজদ্বয় আমেরিকার কোন একটি বন্দর থেকে যাত্রা করল—প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে ভারত মহাসাগরে পড়ে তারা ভারতে আসবে। 'এস হেনরি' অস্ত্র বোঝাই ছিল আর 'ম্যাভারিক'কে পথে একটি জার্মান ক্রুজার 'অ্যানি লারজেন' অস্ত্র সরবরাহ করে দেবে এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে 'লারজেনকে' ওয়াশিংটনের নিকটস্থ হেকিয়ামের কাছে গ্রেপ্তার করে ফেলল এবং তল্লাসী করে যত অস্ত্রপাতি ছিল সে-সব আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করে নিল। এইরূপে

'ম্যাভারিকের' অস্ত্র এনে ভারতে পৌঁছে দেওয়া পণ্ড হয়ে গেল। 'ম্যাভারিক'-কেও জাভাতে খানাতল্লাসী করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোন অস্ত্রপাতি পাওয়া যায়নি। 'এস্ হেনরি' যখন ম্যানিলা থেকে সাংহাই যাত্রা করছিল, তখন তাকে আটক করা হয় ও অস্ত্রগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। জাহাজে দুজন আমেরিকা-বাসী জার্মান ছিলেন, তাঁদের নাম বোয়েমে ও ওয়েদে। বোয়েমেকে সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি চিকাগোর হেরম্বলাল গুপ্তের নির্দেশে ম্যানিলা থেকে জাহাজে ওঠেন। তাঁর উপরে হেরম্বলালের নির্দেশ ছিল যে, তিনি যেন ব্যাঙ্ককে ৫০০ রিভলবার ও চট্টগ্রামে ৫০০০ রিভলবার নাবিয়ে দেন। আর একখানি জার্মান অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ আন্দামানের কাছে এসে পৌঁছলে ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ 'এইচ্ এম্. এস্ কর্ণওয়াল' (H. M. S. Cornwal) সেই জাহাজটিকে আক্রমণ করে। একটি ছোটখাট জলযুদ্ধের পরে জার্মান জাহাজটি সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

এইরূপে জার্মানীর কাছ থেকে অস্ত্র গ্রহণের প্রচেষ্টা— (ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তার Sedition Enquiry Report-এ এই প্রচেষ্টার নাম দিয়েছিল (German Plot) পণ্ড হয়ে গেল।

একদিন বিশ্বাসঘাতকার ফলেই ভারত পরাধীন হয়েছিল। আবার সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই ভারতের এতবড় বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

বুড়ী বালামের তীরে

যতীন্দ্রনাথ যখন সারাভারতব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন চালাচ্ছেন গভর্ণমেণ্টও তখন জানতে পেরেছিল যে তিনিই ভারতের বিপ্লবী মহানায়ক। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্যে গভর্ণমেণ্ট ওয়ারেণ্ট বার করে দিল এবং খুব মোটা পুরস্কার ঘোষণা করল। ধরা পড়লে তাঁর ফাঁসি অবধারিত। তিনি আত্মগোপন করে underground অবস্থায় সমগ্র বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করতে লাগলেন। কলকাতায় আত্মগোপন করে থাকা কঠিন বলে তিনি কলকাতা থেকে স্থানান্তরে চলে যাওয়া স্থির করেন। কতকটা আত্মগোপন করে থাকার সুবিধাও বটে, আবার কতকটা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী কোন অঞ্চলে অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নাবিয়ে নেবার জন্যে যতীন্দ্রনাথ—চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরেন সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল নামক চারজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে বালেশ্বর জেলার কপ্তিপদা নামক স্থানে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কপ্তিপদাতে যতীন্দ্রনাথ গেরুয়া রঙের কাপড় পরে সাধুবেশে থাকতেন। লোকে তাঁকে সাধুবাবা বলে জানত। পল্লীগ্রামের লোকজনের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেন, কারো অসুখ বিসুখ করলে তার সেবা শুশ্রূষা করতেন। বালেশ্বর শহরে বিপ্লবীদের 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামে একটা দোকান ছিল। কলকাতার 'হ্যারী এণ্ড সনস্' ও 'শ্রমজীবী সমবায়'-এর মতই 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'ও ছদ্ম দোকান। দোকানের অন্তরালে বিপ্লবী সংগঠনের একটি ঘাঁটি। যতীন্দ্রনাথ এই 'ইউনিভার্সাল

এম্পোরিয়াম'-এর মারফতেই বাহিরের সঙ্গে আদান প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এখানে অবস্থিতিকালে তুবার ছুটি তুর্ঘটনা ঘটে। যতীন্দ্রনাথকে একদিন সাপে কামড়ায় কিন্তু তিনি আরোগ্য লাভ করেন; আর একদিন মসার পিস্তল চালনা অভ্যাস করতে করতে মনোরঞ্জনের উরুদেশ গুলিবিদ্ধ হয়। মনোরঞ্জন আহত হয়ে পড়েন। কলকাতায় সংবাদ পাঠান হয় এবং ডাঃ আশু দাস সেখানে গিয়ে মনোরঞ্জনকে চিকিৎসা করে আরোগ্য করে তোলেন। ডাঃ আশু দাস শ্রীরামপুরের লোক। ইনি বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে ডাঃ আশু দাস গান্ধী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং হুগলী জেলার একজন বিশিষ্ট নেতা বলে গণ্য হয়েছিলেন। এ যুগের কংগ্রেসনেতা ও মন্ত্রিরূপে বিখ্যাত ভূপতি মজুমদারও সেদিন বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি যতীন্দ্রনাথের একজন বিশেষ স্নেহভাজন শিষ্য ছিলেন। German plot-এর ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথের পরিচালনায় তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এদিকে ভারত গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ডেনহাম সাহেব বিপ্লবী সংগঠনের সূত্র আবিষ্কার করবার জন্য ও বিপ্লবী নায়কদের সন্ধান করে গ্রেফতার করবার জন্য স্বর্গ মর্ত্য তোলপাড় করতে আরম্ভ করেছেন। বাঙলাদেশে ডেনহাম সাহেবকে সাহায্য করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন বাঙলার গোয়েন্দা বিভাগের তুই বড়কর্তা—লোমান সাহেব ও টেগার্ট সাহেব। পরবর্তীকালে (১৯৩০ সালে) এই লোমান সাহেব বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। টেগার্ট সাহেবের ভাগ্য ভাল, বিপ্লবীরা বহুবার তাঁকে

নিধন করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি বেঁচে গেছেন —অবশেষে অক্ষত দেহেই তিনি ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন।

কলকাতায় 'হ্যারী এণ্ড সনস্'-এর দোকান খানাতল্লাসী হোল। এই দোকান তল্লাসীর সময়ে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের একখানি পত্র ধরা পড়ে, তাই থেকে পুলিস কতকগুলি সংবাদ ও সূত্র জানতে পারে।/ এই তল্লাসীর সময়ে শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী ও তাঁর ভাই গ্রেফতার হলেন। হরিকুমার চক্রবর্তী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অতি অন্তরঙ্গ সহকর্মী। বিপ্লব সংগঠনের একটা স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন তিনি। যতীন্দ্রনাথ তাঁর উপরে প্রচুর ভাবে নির্ভর করতেন। বৈদেশিক যোগাযোগের মূল ঘাঁটি-ই ছিল 'হ্যারী এণ্ড সনস্', আর এই ঘাঁটির বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), হরিকুমার চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখার্জী, ভূপতি মজুমদার, সত্যেন সেন প্রভৃতি। কর্ণধার ছিলেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ।

'হ্যারী এণ্ড সনস্' খানাতল্লাসী হওয়ার পরে 'শ্রমজীবী সমবায়' খানাতল্লাসী হোল। এই তল্লাসীর সময়ে অমরেন্দ্রনাথ দোকানে ছিলেন, ডেনহাম সাহেব তন্ন তন্ন করে দোকানে খুঁজেও এক টুকরো কাগজ কি চিঠি কি পুলিসের লাভজনক কোন দ্রব্য, কিছুই পেলেন না। অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা না থাকাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হোল না। তল্লাসীতে কিছুই না পাওয়াতে ডেনহাম সাহেব অমরেন্দ্রনাথকে বললেন, 'তুমি বড় গভীর জলের মাছ।'

অমরেন্দ্রনাথ সত্যই ছিলেন গভীর জলের মাছ! তিনি ছিলেন অসাধারণ কুশলী বিপ্লবী। মানিকতলা বাগানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ ছিল, বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ, হৃষিকেশ কাঞ্জিলালের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় অন্তরঙ্গতা। মানিকতলার বাগানে বোমার কারখানা স্থাপনের অর্থ সরবরাহ করেছিলেন তিনি নিজের স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করে—আর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে বোমা দিয়ে মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য পাঠাবার যাবতীয় ব্যয় তিনি সরবরাহ করেছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারিমোহনের পুত্র মিছরীবাবুর কাছে অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু এসব কাজ তিনি এতই সঙ্গোপনে করেছিলেন যে, গোয়েন্দা পুলিস কিছুই জানতে পারে নি, তাই মানিকতলা বোমার মামলাতে তিনি ধরা পড়েন নি। ডেনহাম সাহেব 'শ্রমজীবী সমবায়' খানাতল্লাসী করবার পরেই অমরেন্দ্রনাথ underground হয়ে গেলেন—গোয়েন্দা পুলিস আর তাঁকে পেল না। এর পরে তিনি প্রায় সাত বৎসরকাল কখনো পাদ্রী সাহেবের বেশে, কখনো সাধুর বেশে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সমস্ত গোয়েন্দা বিভাগ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে বার করতে পারে নি। আসামে একটা জায়গায় থাকবার সময়ে একদিন রাত্রে সশস্ত্র পুলিস সন্দেহক্রমে তাঁকে ধরতে যায়—রাত্রের অন্ধকারে তিনি পুলিসের সঙ্গে বন্দুক চালিয়ে এক খণ্ডযুদ্ধ করে পুলিসকে ঘায়েল করে দিয়ে সরে পড়েন ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এক গভীর জঙ্গলে চলে যান। গভীর বনের ভিতর থেকে তিনি বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বারে বারে ঘুরে ঘুরে তিনি একই জায়গায় ফিরে আসছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখলেন এক বিরাট বাঘ দূরে বসে তাঁর দিকে চেয়ে দেখছে। বাঘটা কিছুক্ষণ তাঁর প্রতি চেয়ে চেয়ে অবশেষে একদিকে চলে গেল। তিনিও দূর থেকে বাঘের অনুসরণ করতে লাগলেন। বাঘের পিছু পিছু তিনি প্রায় এক ক্রোশ আন্দাজ

জঙ্গল অতিক্রম করলেন! বাঘ মাঝে মাঝে পিছু ফিরে ফিরে তাঁকে তাকিয়ে দেখে, আবার চলে যায়। ক্রোশখানেক বাঘকে অনুসরণ করবার পরে তিনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাবার পথ পেলেন।

"হ্যারি এণ্ড সনস্" ও "শ্রমজীবী সমবায়" তল্লাসী করার পরে ডেনহাম সাহেব যাদুগোপাল মুখার্জীর বাড়ি তল্লাসী করেন। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথ যাদুগোপাল মুখার্জীকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান যেন জীবন্ত অবস্থায় ধরা না দেন। তাঁকে তিনি আত্মগোপন করবার নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। যাদুগোপালও underground হয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে বিপিন গাঙ্গুলীও underground হয়ে গিয়েছিলেন।

এর পরে ডেনহাম সাহেব বালেশ্বরে "ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম" তল্লাসী করলেন। সেখানে তল্লাসী করে ডেনহাম কপ্তিপদার হদিস পান। এখানে ডেনহাম "ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম"-এর দু'জন কর্মীকে ও নারায়ণ ব্রহ্মচারী নামক গভর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের এক দারোগাকে গ্রেফতার করেন। এই দারোগা ছিলেন বিপ্লবীদলের বন্ধু। তিনি গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত সংবাদ যা জানতে পারতেন, সেগুলি বিপ্লবীদলকে জানিয়ে দিতেন।

"ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম" তল্লাসী করে কপ্তিপদার হদিস পাওয়ামাত্র ডেনহাম কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ভারতের বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ এইখানেই আত্মগোপন করে আছেন। আর যতীন্দ্রনাথ যে খুব অরক্ষিত অবস্থাতে আছেন, তাও ডেনহাম উপলব্ধি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্মরণ করলেন— Now or never. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী যতীন্দ্রনাথকে পিঞ্জরাবদ্ধ করবার আশায় তাঁর শিরায় ধমনীতে ব্রিটিশ রক্ত উল্লাসে

খর প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি ঝটিতি তাঁর পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যত অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তবু তিনি যতীন্দ্রনাথ। বীরশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ, অদ্বিতীয় শক্তিশালী বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত কাঠামো যিনি কাঁপিয়ে দিয়েছেন, প্রভূত শক্তি সঙ্গে না নিয়ে তাঁর নিকটস্থ হওয়া যায় না, এটা ডেনহাম বেশ বুঝেছিলেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ আয়োজন করে ফেললেন। বালেশ্বর জেলার এবং সন্নিহিত করদ রাজ্য (Native State) নীলগিরি ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সমস্ত সশস্ত্র সৈন্য একত্র করে এক বাহিনী তৈরি করা হোল এবং এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ডেনহাম, বাঙলার গোয়েন্দা পুলিসের কর্তা টেগার্ট, বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি, পাটনার গোয়েন্দা পুলিশের ডি-আই-জি রাইলাণ্ড (Ryland) এবং মিলিটারি লেফ্‌টেনাণ্ট রদারফোর্ড (Rotherford)। এ ছাড়া বহুসংখ্যক দেশীয় অফিসারও সঙ্গে নেওয়া হোল। এতগুলি অফিসার প্রায় তিন শত সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে কপ্তিপদায় চললেন যতীন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করতে। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলল বিপুল সংখ্যক বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার, গোলা-গুলি, বারুদ, টর্চ লাইট, অর্থ, বহু সংখ্যক দারোগা, গোয়েন্দা, দফাদার, চৌকিদার, লোক লস্কর প্রভৃতি। রাত্রিবেলা সাহেবরা বাহিনী নিয়ে হাতী চেপে বালেশ্বর থেকে কপ্তিপদা যাত্রা করলেন।

এদিকে যতীন্দ্রনাথও অসতর্ক ছিলেন না। তিনি চারদিকে সতর্ক প্রহরী রেখেছিলেন। দূর থেকে হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেয়ে তাঁর এক প্রহরী ছুটে এসে তাঁকে সংবাদ দিল। সংবাদ পেয়েই তাঁর সন্দেহ হোল। রাত্রে এদিকে হাতী আসছে কেন? তিনি নিজে বেরিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্থান থেকে দূরে চতুর্দিকে লক্ষ্য

করতে লাগলেন এবং বুঝতে পারলেন হাতী চেপে সাহেবরা আসছে। তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করে নিলেন যে শত্রুরা নিকটে এসে পড়েছে। ঝড়ের বেগে তিনি ডেরাতে ফিরে এলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মনোরঞ্জন ও চিত্তপ্রিয়—জ্যোতিষ ও নীরেন্দ্র ছিলেন বার মাইল দূরে আর একটি গ্রাম তালডিহিতে। তিনি মনোরঞ্জন ও চিত্তপ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে তালডিহিতে চলে গেলেন জ্যোতিষ ও নীরেন্দ্রকে সঙ্গে নেবার জন্য।

যতীন্দ্রনাথ যদি এই রাত্রে জ্যোতিষ ও নীরেন্দ্রকে বাঁচাবার জন্যে তাঁদের কাছে না গিয়ে তাঁদের সাবধান করবার জন্যে তাঁদের কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পলায়ন করতেন, তাহলে তিনি নিরাপদে অনায়াসে পলায়ন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সে ধরনের নেতা ছিলেন না। তিনি অনুচরদের এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছন থেকে পরিচালনা করিতেন না। সর্বাপেক্ষা বিপদ যেখানে বেশী তিনি নিজে সকলের আগে সেখানে যেতেন আর অনুচরদের তাঁর পিছনে নিয়ে যেতেন। তিনি নিজে ছিলেন সর্বতোভাবে 'শির-দার', তাই তিনি হয়েছিলেন সকলের প্রিয়তম সর্দার।

অনেকদিন আগে একবার তাঁর গুটিকতক বিপ্লবী শিষ্য তাঁর প্রাণের ভালবাসা কতখানি তাই পরীক্ষা করবার মতলব করেছিলেন। একদিন তাঁরা তাঁর বাসায় গিয়ে দেখতে পেলেন যে তিনি মুদী কয়লাওয়ালা প্রভৃতির তাগাদায় অস্থির, আর গয়লা দুধ বন্ধ করে দিয়েছে—তাঁর ছেলেরা দুধ পাচ্ছে না। তখন তিনি হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার, বেশ মোটা টাকা বেতন পান। জিজ্ঞাসাবাদ করে শিষ্যরা বুঝলেন যে, দলের জন্য নিজের উপার্জনের সব টাকা ব্যয় করে ফেলেন বলে তাঁর সংসারের এই দুর্গতি। সেদিন যতীন্দ্রনাথ তাঁর পাওনাদারদের সবাইকে বললেন যে, পয়লা তারিখে তাদের টাকা

পরিশোধ করবেন—কারণ ঐ দিন তিনি বেতন পাবেন। শিষ্যরা সব অবস্থা দেখে গিয়ে দলের একটি ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করল। সেই ছেলেটি পয়লা তারিখে বিকাল পাঁচটার সময়ে যতীন্দ্রনাথ অফিস থেকে বেরিয়ে এসে যেখানে ট্রামে চাপবেন সেইখানে রাস্তার ফুটপাতে উষ্ক-খুষ্ক চুলে রুক্ষ মূর্তিতে অতিশয় বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে রইল। যতীন্দ্রনাথ অফিস থেকে বেরিয়েই ছেলেটিকে তদবস্থায় দেখেই তার কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে, কি হয়েছে, এমন মূর্তি, এমন চোখ-মুখ কেন রে তোর?" ছেলেটি একেবারে কেঁদে ফেলল। যতীন্দ্রনাথ পরম আদরে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে বললেন, "কি রে, ব্যাপার কি?" ছেলেটি তখন কাঁদতে কাঁদতে বললে, "বাবার বড় অসুখ, ডাক্তার বলছে অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক, এত টাকা (যতীন্দ্রনাথ যত টাকা বেতন পেতেন ঠিক তত টাকাই বললে) না হলে চিকিৎসা হবে না; কি হবে দাদা, ঘরে যে আমাদের একটিও টাকা নেই?"

যতীন্দ্রনাথ সস্নেহে ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "পাগলা, ঘরে টাকা নেই তার জন্যে এত ভাবনা কিসের? এই নে টাকা, ভাল করে বাবার যত্ন কর, আরো টাকার দরকার হলে আমাকে এসে বলিস।" এই কথা বলে পকেটে বেতনের টাকা ছিল সব তার হাতে তুলে দিলেন! ছেলেটিরও মুখের বিমর্ষভাব অনেকটা কেটে গেল। সে অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবে টাকা নিয়ে চলে গেল! এক মিনিট পরেই যতীন্দ্রনাথ ছুটে তার কাছে যেতেই সে বললে, "কি দাদা?"

যতীন্দ্রনাথ বললেন, "হাঁরে, তোর কাছে তিনটে পয়সা আছে? আমাকে দেত! ট্রামভাড়ার পয়সা চাই কি না!"

ছেলেটির কাছ থেকে তিনটি পয়সা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ট্রামে চাপলেন।

শিষ্যরা সকলেই আড়ালে দাঁড়িয়ে এই ব্যাপার দেখছিল। তারাও পরের ট্রামেই যতীন্দ্রনাথের বাসায় এসে উপস্থিত। সেই ছেলেটি অবশ্য সঙ্গে নেই, কিন্তু শিষ্যরা টাকাগুলো নিয়ে এসেছে।

যতীন্দ্রনাথ বাসায় এসে পৌঁছবার মিনিট কয়েক পরেই শিষ্যরা এসে উপস্থিত হোল। যতীন্দ্রনাথ সবাইকে নিয়ে বসে গল্পগুজব করছেন আর যতীন্দ্রনাথের দিদি (বিনোদিনী দেবী) সকলকে চা ও কিছু জলখাবার দিচ্ছেন, এমন সময়ে পাওনাদার মুদী গয়লা প্রভৃতিরা এসে হাজির হোল। তাদের দেখেই যতীন্দ্রনাথের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে একজন বললে, "দাদা, ওদের আগে টাকা দিয়ে বিদেয় করুন, নইলে ওরা ভারি disturb করবে—আমাদের গল্পগুজবের রসভঙ্গ হয়ে যাবে।" যতীন্দ্রনাথ কি করবেন তাই ভাবছেন, আর মাথা চুলকুচ্চেন দেখে একটি ছেলে টাকাগুলি বার করে তাঁর হাতে দিয়ে তাঁকে একচোট খুব কষে স্নেহের তিরস্কার করে বলল, "আপনি সব টাকা কোন্ আক্কেলে দিয়ে দিলেন?"

যতীন্দ্রনাথ বললেন, "ও যে এত টাকার কথাই বললে!"

তখন শিষ্যরা তাঁকে সব কথা খুলে বললে। তাঁকে পরখ করার জন্যে যে এ অভিনয়, তাও বললে এবং তিনি নিজের জন্য কিছুই না রেখে সব টাকাই দিয়ে দেওয়ার জন্যে আবার অনুযোগ জানাতে লাগল। যতীন্দ্রনাথ তখন কাচুমাচু হয়ে বললেন, "তোদের কারো কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখলে যে আমার বিশ্বসংসার কিছুই আর মনে থাকে না।"

এই নেতা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

কাজেই তিনি কি জ্যোতিষ আর নীরেনকে ফেলে রেখে নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে পারেন ?

যতীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন ও চিত্তপ্রিয়কে নিয়ে রাত্রেই তালডিহিতে চলে গেলেন। সাহেবরা সকাল হবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সকাল হলে তারা যতীন্দ্রনাথ যে ডেরাতে থাকতেন, সেখানে লোক পাঠিয়ে দিল। লোক ফিরে এসে খবর দিল, 'ঘর খালি, কেউ নেই'। পরে সাহেবরা নিজেরা সরেজমিনে গিয়ে দেখতে পেল সব ফাঁকা, কেউ সেখানে নেই।

যতীন্দ্রনাথদের ডেরাটি সাহেবরা তল্লাসী করে কয়েকখানি ভাল বই ও যতীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত একখানা খাতা পায়। এই খাতাখানিতে যতীন্দ্রনাথ যা সব চিন্তা করতেন, মাঝে মাঝে সেইগুলি লিখে রাখতেন। এই খাতাখানা পাঠ করে সাহেবরা পরে মন্তব্য করেছিল, যে মানুষ এতখানি মহান চিন্তা করে থাকেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর একজন চিন্তা-নায়কের (thought-leade of the world) আসন পাওয়ার অধিকারী।

অতঃপর সেই বিরাট সশস্ত্র বাহিনী চারদিকে ছুটোছুটি করে এই পলাতক বিপ্লবীদের খুঁজে বেড়াতে লাগল। তারা গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করতে লাগল যে, কতকগুলি বাঙালী ডাকাত এসেছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে লোকপিছু দু' শ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে।

তখন এই 'বাঙালী ডাকাত' ধরিয়ে দেবার জন্য স্থানীয় লোকেরা উৎসাহে মেতে উঠল।

যতীন্দ্রনাথ সেই রাত্রে মনোরঞ্জন ও চিত্তপ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে তালডিহিতে গিয়ে জ্যোতিষ ও নীরেন্দ্রের সহিত মিলিত হলেন। পরের দিন রাত্রে আবার পাঁচজনে কপ্তিপদায় ফিরে এলেন। এখানে

মণীন্দ্র চৌধুরী নামে একজন বাঙালী ঠিকাদার বাস করতেন। তিনি ছিলেন এঁদের বিশেষ হিতৈষী। মণীন্দ্রবাবুর কাছে যতীন্দ্রনাথ নিজেদের টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখতেন। গভীর রাত্রে যতীন্দ্রনাথ গোপনে মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব সংবাদ অবগত হলেন। মণীন্দ্রবাবুর কাছে তাঁদের গচ্ছিত অর্থ থেকে কিছু টাকা নিয়ে পাঁচ জনে আবার চলে গেলেন। বিদায় নেবার সময়ে মণীন্দ্রবাবু বেদনায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। তিনি খুবই স্নেহ করতেন এঁদের। একটা খুব গোপন নিরাপদ পার্বত্য পথের সন্ধান দিয়ে সেই পথ ধরে যেতে অনুরোধ করলেন, তাহলে তাঁরা বেশ নিরাপদে পালাতে পারবেন বললেন। খুব সম্ভবতঃ বিপ্লবী মহানায়ক তাঁর ইতিকর্তব্য মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন। মণিবাবু তাঁকে গোপন নিরাপদ পার্বত্য-পথে পলায়ন করবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতেই যতীন্দ্রনাথ একেবারে যতীন্দ্রনাথের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, "বলেন কি দাদা, কেবল প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্যে কি সারাজীবন Absconder হয়ে থাকব? তা হবে না। We shall perform our last act which will create a moral impression in the country."

ইতিপূর্বেই যতীন্দ্রনাথ তাঁর সাধের ভারতব্যাপী বিপ্লব আয়োজন ও জার্মান সাহায্যের ব্যবস্থা যে পূর্বাহ্নেই ফেঁসে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেছে, এ সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি এখন বিপ্লব আয়োজনের ব্যর্থ যজ্ঞে নিজেকে পূর্ণাহুতি দেবার জন্যই প্রস্তুত হলেন। সহচর শিষ্য চারটিও তাঁদের গুরু ও নায়কের সঙ্গে এক গতি লাভের জন্যই প্রস্তুত হলেন। তাঁরা ইংরেজ শক্তির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

পরের দিন তাঁরা যাত্রা করলেন বালেশ্বরের দিকে। নির্ভীক

বে-পরোয়াভাবে চললেন তাঁরা বালেশ্বর শহরের দিকে। নিরাপদে তাঁরা বালেশ্বর স্টেশনে এসে পৌঁছুলেন। একটা অপেক্ষমান ট্রেন দেখতে পেয়ে টিকিট কিনে পাঁচজনেই তাতে চাপলেন। কিন্তু সহসা যতীন্দ্রনাথের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হোল। পাঁচজনেই ট্রেন থেকে নেমে এলেন। যতীন্দ্রনাথ ইংরেজের আসন্ন আক্রমণ এড়িয়ে দূরে পালিয়ে যাবেন? ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরা তৈরি হয়ে এসেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী মহানায়ককে গ্রেফতার করতে। তারা জানে যে তাঁকে জীবন্ত গ্রেফতার করা অসম্ভব, তাই তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে। যুদ্ধের যে আয়োজন তারা সঙ্গে করে এনেছে তাও সামাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী মহানায়কের মর্যাদার অনুপযুক্ত নয়। সুতরাং কেন তিনি সেই প্রত্যাসন্ন যুদ্ধকে এড়িয়ে সরে যাবেন? ভারতব্যাপী বিপ্লব প্রচেষ্টা পণ্ড হয়েছে বটে কিন্তু সেই বিপ্লব প্রচেষ্টার অবসান এখনো হয়নি। সেই বিপ্লব প্রচেষ্টার মহানায়ক তিনি এখনো সশস্ত্র, জীবিত! তাঁর জীবনাবসানের পূর্বে এই বিপ্লব প্রচেষ্টারও অবসান নেই। যৌবনের প্রারম্ভে যে বিপ্লব-যজ্ঞের উদ্বোধন করেছিলেন, লোকোত্তর প্রতিভা দিয়ে, অলৌকিক বীরত্ব ও দক্ষতা দিয়ে যে বিপ্লবের আয়োজন করেছিলেন, আজ নির্বাণের পূর্বে তাইতে নিজেকে শেষ সমিধরূপে আহুতি দিবেন তিনি।

মন তখন বড় উঁচু সুরে বাঁধা। পাঁচজনেই বালেশ্বর শহর পরিত্যাগ করে উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে পল্লী অঞ্চলের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করতে লাগলেন। একটা প্রকৃতি-রক্ষিত দুর্ভেদ্য স্থান চাই ঘাঁটি করবার জন্য, যেখান থেকে প্রাকৃতিক আবরণে অনেকটা আত্মরক্ষা করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে যোঝা সম্ভব।

যতীন্দ্রনাথ অনুচরদের নিয়ে পার্বত্য জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে বুড়ী বালাম নদীর তীরে এসে পৌঁছুলেন। সাঁওতালদের একখানা কাঠ বওয়া নৌকাযোগে নদী পার হলেন। একটি গ্রাম্য লোক এঁদের জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে সন্দেহ করে গ্রামের দফাদার-বাড়িতে সংবাদ দিলেন। সংবাদ শুনে বহু গ্রাম্য লোক এসে জড়ো হল। সকলেরই ধারণা হল যে এরাই সেই বাঙালী ডাকাত। তখন জনতা তাঁদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করতে তাঁরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে চলে যান এবং কিছুদূরে গিয়ে দামুদ্রা নামক গ্রামে পৌঁছান। কিন্তু চারিদিকে তখন তাঁদের কথা নিয়ে হৈ হৈ চলছে। দামুদ্রা গ্রামের মোড়ল রাজমহান্তি এবং সুদানি গিরি নামক দু'জন লোক এসে এঁদের আটক করার চেষ্টা করে। এঁরা তখন বলপ্রয়োগের দ্বারা পথ করে নিতে বাধ্য হলেন। মনোরঞ্জন গুলি করল; রাজমহান্তি নিহত হোল ও সুদানি গুরুতর আহত হোল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তাঁরা জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু দূরে থেকে কেউ কেউ তাঁরা কোন্ দিকে চললেন লক্ষ্য রাখতে লাগল। দফাদারের বাড়ির লোকেরা এবং অন্যান্য লোকেরা গভর্ণমেণ্ট বাহিনীর সকাশে সংবাদ দিবার জন্য সদরে ছুটল।

দু'দিন আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই। তার উপরে দিন রাত্রি পথ চলেছেন, সকলেরই শরীর ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ন। পথে একটা সামান্য গ্রাম্য দোকান পেলেন, সেইখানে বসে চিড়ে মুড়কী বাতাসা পাওয়া গেল, তাই পেটভরে খেলেন, দোকানীর ঘটিতে করে আশ মিটিয়ে জল পান করলেন। দোকানীর জিনিসের দাম পাওনা হল দেড় টাকা, সঙ্গে খুচরা ছিল না, দোকানীকে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। কিছুদূর যাবার পরে আবার

একদল গ্রাম্য লোক এসে তাঁদের ঘিরে দাঁড়াল। পাঁচজনকে ধরিয়ে দিতে পারলে তারা হাজার টাকা বকশিশ পাবে, সেই লোভে তারা উন্মাদ হয়ে উঠল। পুনরায় এদের সঙ্গে সংঘর্ষ হোল। একজন ছুটে এসে যতীন্দ্রনাথকে জাপটে ধরল, যতীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে তাকে শূন্যে তুলে এক আছাড় মারলেন। এক আছাড়েই সে জখম হয়ে গেল। অন্যান্য লোকদের চলে যাবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হলে এঁরা তাদের মৌখিক ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা তখন ডাকাত ধরিয়ে দিয়ে হাজার টাকা বকশিশ পাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। কোন কথাতেই যখন ফল হল না, তখন মনোরঞ্জন গুলি ছুঁড়ল। একজন মারা গেল, জন কয়েক জখম হোল। জনতা পালিয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথরাও গ্রাম ত্যাগ করে এগিয়ে চললেন। গ্রামে ছাড়িয়ে প্রায় আধ মাইল যাবার পরে একটা নদী পড়ল; সাঁতার দিয়ে তাঁরা নদী পার হলেন। দূর থেকে ভিখারী-বেশী একটি ছদ্মবেশী দারোগা এঁদের অনুসরণ করে চলছিল, সেও দূর থেকে সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে একটা গাছের উপরে উঠে এঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখে দিল। ছদ্মবেশী দারোগাটির নাম চিন্তামণি সাহু।

বিপ্লবীরা যেতে যেতে ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা বিরাট উই ঢিবি পেলেন। এই উই ঢিবিটাকে একটা মজবুত প্রাকৃতিক ট্রেঞ্চের মতন মনে হোল। পাঁচজনে এরই অন্তরালে আশ্রয় নিলেন।

ইতিমধ্যে কিলবি ও রদারফোর্ড পরিচালিত বাহিনী ঐ অঞ্চলে এসে পৌঁছল। গ্রামের লোকেরা তাদের জানাল যে বাঙালী ডাকাতরা জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। কোন্ দিকে যে বিপ্লবীরা গেছেন ওঁরা ঠিক বুঝতে পারছিল না, এমন সময়ে সেই গাছের উপর থেকে দারোগা চিন্তামণি একটা ডালে ন্যাকড়া বেঁধে তাই দুলিয়ে সাহেবদের সঙ্কেত

করল, সাহেবরা সেই সঙ্কেত দেখতে পেয়ে ফৌজ নিয়ে তাড়াতাড়ি সেইখানে এসে উপস্থিত হোল। দারোগো সাহেবদের অদূরের সেই উইঢিবি দেখিয়ে দিল। তখন সেই সরকারী বাহিনীর তিন শত রাইফেল গর্জন করে উঠল। প্রান্তর প্রকম্পিত করে দূরের জঙ্গলে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে সেই গভর্ণমেণ্ট-বাহিনী রাইফেলের গুলি বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে চলল।

গভর্ণমেণ্ট-বাহিনীর রাইফেল গর্জন করতে লাগল আর অগ্রসর হতে লাগল কিন্তু বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কোন বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া গেল না। এতে গভর্ণমেণ্ট-বাহিনী উল্লাসে আনন্দে অগ্রসর হতে লাগল—তারা বুঝল যে, বিপ্লবীদের হাতে দূর-পাল্লার অস্ত্র নেই।

যতীন্দ্রনাথ যে কত বড় সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন তা এই যুদ্ধের বিবরণ থেকে যুদ্ধবিশারদগণ উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন।

যতীন্দ্রনাথ অনুচরদের সঙ্গে তাঁদের মসার পিস্তল গুলিভর্তি করে প্রস্তুত হয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মসার পিস্তল হচ্ছে একরকম পিস্তল, যা' বাঁট বাড়িয়ে নিলে রাইফেলের মতন কাজ করে। গভর্ণমেণ্ট-বাহিনী নিশ্চিন্ত মনে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে অগ্রসর হয়ে চলল। ঢিবির আড়ালে তারা বিপ্লবীদের দেখতে পাচ্ছে না। বিপ্লবীরাও সেই সু-উচ্চ ও প্রশস্ত ঢিবির অন্তরালে বেশ নিরাপদে অবস্থিতি করছেন, বিপক্ষের গুলি সবই প্রশস্ত ঢিবির ভিতরে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, একটিও তাঁদের স্পর্শে করতে পারছে না। গভর্ণমেণ্ট-বাহিনী এগুতে এগুতে যখন নাগালের (Range-এর) মধ্যে এসে পৌঁছাল, অমনি যতীন্দ্রনাথ আদেশ দিলেন Fire!

বিপ্লবীদের পাঁচটি মসার পিস্তল এক সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ গুলি উদ্গীরণ করতে লাগল, আর সেই গুলির মুখে লেফটেনাণ্ট রদারফোর্ডের

ফৌজ হতাহত হতে হতে ভাদ্র মাসের বর্ষায় ভিজে মাঠের কাদায় গড়াগড়ি দিতে দিতে পিছু হঠতে লাগল।

রদারফোর্ডের বাহিনী কাদাভরা মাঠে শুয়ে পড়ল, অনেকে আলের আড়ালে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে রাইফেল চালাতে লাগল।

বিপ্লবীরা অনবরত গুলি চালনা বন্ধ করলেন, কেননা তাঁদের সঙ্গে ত অজস্র গুলির সম্ভার নেই। সরকারী ফৌজের কেউ যেই উঠে বসে, কিংবা মাথা উঁচু করে তোলে, অমনি বিপ্লবীরা অব্যর্থ সন্ধানে তাকে গুলি করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই যুদ্ধের তুলনা নেই। বুড়ী বালামের তীরে সেদিন রচিত হোল ভারত-মুক্তি-সংগ্রামের মহত্তম তীর্থক্ষেত্র। একদিকে তিন শ রাইফেলধারী সৈন্য আর একদিকে মসার পিস্তল-ধারী পাঁচটি যোদ্ধা। কিন্তু তবুও যে বীরত্ব, সাহস আর নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই পঞ্চবীর তিনশত উন্নততর অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন আর শত্রুপক্ষের যে পরিমাণ সৈন্য সংহার করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা অদ্বিতীয়, অনন্য-দৃষ্টান্ত ঘটনা। শত্রুপক্ষের একটি বুলেট লেগে যতীন্দ্রনাথের বাঁ হাতের বুড়া আঙুলটি চূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি কেবলমাত্র ডান হাত দিয়েই মসার পিস্তল চালাতে লাগলেন। চিত্তপ্রিয়র কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে একটা গুলি চলে গেল। পরক্ষণেই যেই তিনি মাথা তুলেছেন, একটি গুলি এসে তাঁর মাথায় লাগল, অমনি 'দাদা' বলে তিনি যতীন্দ্রনাথের কোলের উপরে ঢলে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল। চিরঞ্জীব চিত্তপ্রিয়! সারাজীবন যে নেতার নির্দেশ তিনি ক্যাশাবিয়াঙ্কার মত পালন করেছেন, যে নেতাকে তিনি জীবনের প্রিয়তম দয়িতরূপে ভালবেসেছেন, ভক্তি করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরই কোলের উপরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বিপ্লবী জীবনের

চরম আনন্দ ও গৌরব লাভ করে চিত্তপ্রিয় স্বদেশের ইতিহাসে চির-অমরতা অর্জন করলেন। চিত্তপ্রিয় ছিলেন যতীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড। অপর সময়ে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর কোলের উপরে চিত্তপ্রিয়ের স্বাভাবিক মৃত্যু হোত, তাহলে তিনি হয়ত পুত্রশোকাতুর অন্ধমুনির মতই ব্যাকুল ও বিবশ হয়ে পড়তেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শোকেরও অবকাশ নেই। যতীন্দ্রনাথ গভীর স্নেহে সজল নেত্রে বিগতপ্রাণ চিত্তপ্রিয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন, তার পরে আবার পিস্তল চালাতে লাগলেন। জ্যোতিষ, মনোরঞ্জন ও নীরেন সকলেই গভীর স্নেহের সঙ্গে চিত্তপ্রিয়ের দেহে হাত বুলিয়ে আবার দ্বিগুণ উৎসাহ ও তেজের সঙ্গে পিস্তল চালনা করতে লাগলেন।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক যুদ্ধ চলেছিল। এই তিন ঘণ্টাকাল রদারফোর্ডের বাহিনী ক্রমাগত দূর থেকে অজস্র গুলিবর্ষণ করেছে কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে এগিয়ে যেতে পারে নি। ক্রমে জ্যোতিষ মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়লেন, আর যতীন্দ্রনাথের পেটে একটি এবং চোয়ালে একটি গুলি বিদ্ধ হোল। সঙ্গের টোটাও সব ফুরিয়ে গেল। তখন মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্র আহত জ্যোতিষ ও যতীন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যুদ্ধ শেষ হোল। প্রতিপক্ষ বুঝতে পারল যে বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে গেছে। তখন তারা সাবধানে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তারা এগিয়ে এসে বিপ্লবীদের ঘিরে দাঁড়াল। যতীন্দ্রনাথের বীরত্বের কথা সাহেবরা আগে থেকেই জানতেন; আজকের যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখে তাঁরা বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথের দেহ থেকে তখন প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছিল। তিনি কিলবিকে বললেন, "The entire responsibility is mine. These boys are innocent; they have simply carried out my orders. Please see that no injustice is

done to them under the British Raj." ("সমস্ত দায়িত্ব আমার। ছেলেরা নির্দোষী। এরা কেবল আমার আদেশ পালন করেছে। এদের উপরে অবিচার করবেন না!")

যতীন্দ্রনাথ কত বড় মহাপ্রাণ নেতা ছিলেন তাঁর এই অন্তিম উক্তি থেকেই তা বুঝতে পার যায়। সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের মাথায় নিয়ে শেষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে পারেন।

মুমূর্ষু যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বর হাসপাতালে পাঠান হয়। একদিন পরে সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইন্দ্রপতন হোল।

বিশেষ আদালতে মনোরঞ্জন, নীরেন্দ্র ও জ্যোতিষের বিচার হয়। মনোরঞ্জন ও নীরেনের ফাঁসি হয়, জ্যোতিষের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বহু বৎসর কঠোর কারাবাসের ফলে জ্যোতিষ উন্মাদ হয়ে যান এবং উন্মাদ আগারেই তাঁর বন্দীজীবনের অবসান হয়।

ফাঁসির আগের দিন নীরেন ও মনোরঞ্জন জেলখানা থেকে তাঁদের সহকর্মী ও যতীন্দ্রনাথের আর একজন শিষ্য শ্রীভূপতি মজুমদারকে একখানা চিঠি লিখে পাঠান। এই চিঠিতে তাঁরা লিখেছিলেন, "কাল আমাদের জীবনের বিজয়া দশমী। ঐ দিনে চিরপ্রিয় জন্মভূমিকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাবার আগে জন্মভূমির স্বাধীনতার কামনা করে যাব। যদি ব্রত অসমাপ্ত থেকে যায়, প্রার্থনা করব যেন আবার এই দেশে জন্মগ্রহণ করি এবং ব্রত উদ্‌যাপন করে যেতে পারি।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র হলে প্রকৃত সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যতীন্দ্রনাথের আত্মীয়দের অনুরোধে ব্যারিস্টার জে. এন. রায় টেগার্টের সহিত সাক্ষাৎ করে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। টেগার্ট জে. এন. রায়কে বলেন, "Unfortunately he is dead."—("দুর্ভাগ্যের কথা যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।")

জে. এন. রায় তখন বলেন, "Why do you say unfortunately ?"—("দুর্ভাগ্যের কথা বলছেন কেন ?")

টেগার্ট উত্তর করেছিলেন, "I have met the bravest Indian. I have the greatest regard for him but I had to do my duty." ("তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী ব্যক্তি। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে—তবে আমাকে আমার কর্তব্য করতে হয়েছিল।")

মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী নেতৃজীবন শেষ হোল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৫ সাল, বিশেষ করে ১৯১০ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল ভারতের বিপ্লবী নেতারূপে কাজ করেছিলেন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি ভারতে এবং ভারতের বাহিরে কত বড় বিশাল বৈপ্লাবিক সংগঠন তৈরি করেছিলেন সে বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই বৈপ্লবিক সংগঠনের ফলে ইংরেজ সাম্রাজ্য কেঁপে উঠেছিল। আয়োজন যতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করেছিলেন কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, ইংরেজ রাজশক্তিকে শেষ আঘাত তিনি হেনে যেতে পারেন নি। যেভাবে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধ করে স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ উৎসর্গ করে গেলেন তা হয়ে রইল চিরকালের দৃষ্টান্ত। পরবর্তী কালে ভারতের শত সহস্র বিপ্লবী শহীদকে এই দৃষ্টান্ত প্রেরণা দান করেছে। মৃত্যুর পরও তিনি শত সহস্র স্বাধীনতার পূজারীকে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। তাঁর

শহীদ যতীন্দ্রনাথ
মৃত্যুর পরে বালেশ্বর হাসপাতালে গৃহীত আলোক চিত্র

প্রজ্জ্বলিত অনির্বাণ বিপ্লবাগ্নিশিখা ভারতের দিকে দিকে সকল বিপ্লবী বীরের প্রাণের মশালে অগ্নি সঞ্চার করেছে। সেই বহ্নিকুণ্ড থেকে বহ্নি গ্রহণ করেছেন পরবর্তীকালের সকল ভারতীয় বিপ্লবী—সূর্য সেন, ভগৎ সিং, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাঁদের সহচর সহকর্মী, সকলেই। যতীন্দ্রনাথ তাঁর অমর আত্মোৎসর্গের দ্বারা এমন নৈতিক শক্তি ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে দিয়ে গেলেন, যে শক্তির শেষ পরিণতির কাছে একদিন ইংরেজের রাজশক্তি তার মাথার মণিকে নাবিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেল।

ইংরেজের অধীনতা থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্যে তিনটি বিরাট জাতীয় সংগ্রাম ভারতে হয়েছিল। প্রথমটি সিপাহী বিপ্লব; এই সংগ্রামের মহানায়ক নানা সাহেব। দ্বিতীয়টি ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন; এই সংগ্রামের মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ; তৃতীয়টি অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন; এই সংগ্রামের মহানায়ক মহাত্মা গান্ধী। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতারূপে রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ও সংগ্রামের শেষ অধ্যায়। যতীন্দ্রনাথ যা আরম্ভ করে শেষ করে যেতে পারেন নি, রাসবিহারী ও নেতাজী সেই পরিকল্পনার একাংশ (ভারতের বাহিরের অংশটি) সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করেন।

নানা সাহেব, যতীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীনতার সংগ্রামের সংগঠক ও নেতাহিসাবে প্রত্যেকেই বিরাট পুরুষ। বিস্ময়কর তাঁদের প্রতিভা, অচিন্তনীয় তাঁদের শক্তি ও বীরত্ব, অপরিমেয় তাঁদের দেশপ্রেম। নেতৃত্বের যোগ্য গুণপনায় তাঁরা প্রত্যেকেই অতিমানব। কালের বিভিন্নতা ও কর্মপদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এঁরা তিনজন যুগ প্রবর্তক নেতা। ভারতবর্ষের

ইতিহাসভালে এঁদের জীবনস্মৃতির সীমন্তবিন্দু চিরকাল শুকতারার মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে থকেবে।